ঋষি অরবিন্দ

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৩/২ এ [illegible] রো, [illegible]

প্রকাশক ঃ
শ্রীকমল বিশ্বাস
৭০ মহেন্দ্রচন্দ্র গার্ডেন রোড
কলিকাতা - ৩০

দ্বিতীয় প্রকাশ—চৈত্র, ১৩৭১

প্রচ্ছদ—শ্রীসব্যসাচী দাশগুপ্ত

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীকৃষ্ণমোহন ঘোষ
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২ কেশব সেন স্ট্রীট

আমাদের ভাতিময় ভারতের সুষমা-সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় পরম পুলকপ্রদ পদ্য-প্রবাহে বিরচিত "গীতা" গ্রন্থ সমগ্র জগতের একখানি অগ্রগণ্য গ্রন্থ। সেই অগ্রগণ্য 'গীতা' গ্রন্থে মহতো মহীয়ান্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, সাধারণ লোকে সেরূপ ক'রে থাকে ; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা প্রমাণ ব'লে মানেন, অন্যে তারই অনুসরণ করে।"

এই সময়ে, শ্রেষ্ঠ এক মানবের নাম নিশ্চয়ই আমাদের মনোমধ্যে সমুদিত হচ্ছে। সেই নামটি হচ্ছে—শ্রীঅরবিন্দ।

শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চয়ই আমাদের আদর্শ। সেই আদর্শ আমাদের প্রদান করে চরম ও পরম হর্ষ। হর্ষাতিহর্ষ।

উঠ, জাগো!

এই বিশ্বসৃষ্টির মূল ভাবটি কি?

এই বিশ্বসৃষ্টির মূল ভাবটি হচ্ছে :

উঠ, জাগো!

কাজে লাগো!

—নিজে জাগো ; অন্যকে জাগাও!

শ্রীঅরবিন্দ নিজে জেগেছেন ; অন্যকেও জাগিয়েছেন। তাই তিনি হয়েছেন আমাদের আদর্শ।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ—শ্রীঅরবিন্দ।

বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে লোকে যাকে বলত শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, বর্তমানে তাঁকে বলে শ্রীঅরবিন্দ। "ঘোষ" আর বলে না। বলবার দরকার হয় না।

কেন বলে না? কেন বলবার দরকার হয় না?

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ-এর নাম শ্রদ্ধার সহিত ঘোষিত হয়ে গেছে মানুষের বহির্জগতে এবং অন্তর্জগতে। তাই অরবিন্দের নামের সঙ্গে 'ঘোষ' শব্দটি কেউ আর বলে না, বলবার দরকার হয় না।

মানুষ তার পরম প্রিয়জনের কথা বলবার সময়ে, কেবলমাত্র তার নামটিই তো ব'লে থাকে।

সাধু-সন্তদের নাম এবং বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম ঐরূপেই উক্ত হয়।

শ্রীঅরবিন্দের মাহাত্ম্য

অরবিন্দ শব্দটির অর্থ কি ?

অরবিন্দ শব্দটির অর্থ—পদ্মপুষ্প।

অরবিন্দ সরোবরে প্রস্ফুটিত হয়। অরবিন্দ কালক্রমে মলিন হয় ; শুষ্ক হয়।

কিন্তু বিশ্বসরোবরে বিকশিত শ্রীঅরবিন্দ কোনদিন মলিন হবেন না ; বিশুষ্ক হবেন না। এই বিশ্বে শ্রীঅরবিন্দ চিরভাস্বর।

কেন ?—কেন শ্রীঅরবিন্দ চিরভাস্বর ?

একদা ভারত ছিল পরাধীন। সেই পরাধীন ভারতে অরবিন্দ স্বাধীনতার স্বর্ণ-ধ্বজা করেছেন উড্ডীন। তাই তিনি চিরভাস্বর।

সংস্কৃত গ্রন্থে উক্ত হয়, অব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র সাধনা-বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছেন—দিব্য দৃষ্টি, দিব্য ভাব, দিব্য জ্ঞান লাভ করেছেন।

অরবিন্দ ঘোষও সামাজিক প্রথা অনুসারে অব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন—প্রাপ্ত হয়েছেন দিব্য দৃষ্টি, দিব্য ভাব, দিব্য জ্ঞান। তাই শ্রীঅরবিন্দ চিরভাস্বর।

অরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ

ভারতের একাধিক শ্রদ্ধেয় সংস্কৃত গ্রন্থে কথিত আছে, বর্তমান যুগ বা কাল 'কলিকাল'।

এ কথাটি উপহাসের বিষয় হয় না।

এই কলিকালে কলিকাতা শহর নানা কারণে কতই কৌলিন্যশীল ! —মানুষের সমাজের নানা ক্ষেত্রের নানারূপ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কলিকা-ক্ষেত্রে এই কলিকাতাতেই সংঘটিত হয়েছে।

কলিকাতা নগরেরই একটি প্রতিবেশী শহর হচ্ছে কোন্নগর। নানা কারণেই কোন্নগরেরও যথেষ্টই কৌলিন্য রয়েছে।

কোন্নগরের প্রাচীন ঘোষ বংশের গৌরবও সুপ্রাচীন। সেই ঘোষ বংশের একটি সুযোগ্য সন্তানের নাম কৃষ্ণধন ঘোষ। কৃষ্ণধন ঘোষ হচ্ছেন অরবিন্দের পিতা।

যাঁরা নানারূপে দেশের সেবা করেন, যাঁদের অবদান সুমহান, তাঁরা সর্বদাই স্মরণীয়। তাই, এখানে ঘোষ পদবীযুক্ত শ্রদ্ধেয় জনের উল্লেখ প্রসঙ্গে ঐ পদবীযুক্ত আরও কতিপয় কীর্তিমান মানুষের নামোল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ, ব্যবহারজীবী রাসবিহারী ঘোষ, নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ, সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ, ধর্ম-সাহিত্য প্রণেতা ও সাংবাদিক শিশিরকুমার ঘোষ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির জীবন-কথা আদরণীয় বটে।

এদেশের লোকের ইংলণ্ড গমনকে সাধারণত বলা হয় 'বিলেত যাওয়া'। কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয় বিলেতে গিয়েছিলেন। সেখানে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে চিকিৎসক বা ডাক্তার হয়েছিলেন। কৃষ্ণধন বিলেতের এবাডিনে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এম্. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন তাঁকে বলা হতে লাগল ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ, এম্. ডি.। লোকে সাধারণত তাঁকে বলত ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ।

ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষই ভারতের প্রথম আই-এম্-এস্ ডাক্তার ব'লে অভিহিত হন।

বিদেশ হ'তে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর কৃষ্ণধন ঘোষ তাঁর এই স্বদেশে সিভিল সর্জন পদে নিযুক্ত হন। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত খুলনাতে তিনি বেশ কিছুকাল কাটিয়েছিলেন।

এই শ্রীকৃষ্ণের দেশের সন্তান কৃষ্ণধন ঘোষ বেশ কিছুকাল যাবৎ

বিলেতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে সেখানে বসবাস করলেন। সেখানকার জনগণের সঙ্গে মেলামেশা করলেন।

ইহার ফলে তাঁর চিত্ততলে একটা ধারণা সঞ্জাত হ'ল : ইউরোপের সব কিছুই ভালো ; আর ভারতের সব কিছুই কালো—খারাপ—মন্দ।

ভারত-সন্তান কৃষ্ণধন ঘোষ আচার-ব্যবহারে ও পোশাক-পরিচ্ছদে যেন আর ভারতীয় ছিলেন না। যেন ইউরোপীয় ভাব ভাড়া ক'রে, তাই দিয়েই জীবন যাপন করছিলেন।

তাঁর মাতৃভাষা বাংলা ভাষাও তাঁর মুখে ছিল না—যেন দূরে—অতি দূরে ভেসে গিয়েছিল।

তাঁর বাঙালী ভৃত্যরা ইংরেজী ভাষা জানত না। ইংরেজী না-জানা সেই ভৃত্যদের সঙ্গে বিলাত-ফেরত কৃষ্ণধন ঘোষ কথা বলতেন কোন ভাষায়? বাংলা ভাষায়?

মোটেই না। কথা বলতেন বিলাতী ভাষায়—ইংরেজী ভাষায় অথবা হিন্দী ভাষায়। বাংলা ভাষাকে তাঁর হয়তো মনে হ'ত জংলী ভাষা।

বিলাত-ফেরত হওয়ার সেইরূপ অযৌক্তিক পরিণাম নিশ্চয়ই বিলাপের বিষয়।

'খুলনার দাতাকর্ণ'

কিন্তু বিলাত-ফেরত ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের মধ্যে ঐরূপ কালো ভাব এসে পড়লেও তাঁর মধ্যে আলো-ভাবেরও মোটেই অভাব ছিল না।

তিনি তাঁর ভারতীয় ভাইদের তাঁর নিকট হ'তে দূরে সরিয়ে দিতেন না। শত শত দরিদ্রের পক্ষে তিনি ছিলেন দানশীল সুহৃদ।

কৃষ্ণধনের ধন বা অর্থ দরিদ্রের স্বার্থ সিদ্ধ করত। মুক্তহস্তে তাঁর দান কত লোককে দুঃখ-দুর্দশা হ'তে মুক্ত করত।

সংস্কৃত ভাষায় ব্যাস-বিরচিত মহাভারত সুমহান মহাকাব্য। জগতের কাব্যক্ষেত্রে মহাভারত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মহাভারতে কথিত হয়েছে কত না মহান নর-নারীর কাহিনী। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মহাবীর কর্ণ। কর্ণ কেবল মহাবীর নন। তিনি অতুলনীয় দাতাও। তাই তাঁকে বলা হয় 'দাতাকর্ণ'।

যখন-তখন যে-কোন দরিদ্রের দুঃখ মোচনে অকাতরে অর্থ দানে তৎপর ছিলেন অরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ। তাই লোকে শ্রদ্ধা ও হর্ষভরে তাঁকে বলত দাতাকর্ণ—'খুলনার দাতাকর্ণ'।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, তখনকার ভারতের শোচনীয় পরাধীনতায় কৃষ্ণধন বড়ই দুঃখ বোধ করতেন। তিনি চাইতেন, সেই দুঃখ দূর হোক, ভারত ভাতিশীল হোক!

ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের মনের মূর্তিটির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁর দৈহিক দৃশ্য কিরূপ ছিল?

কৃষ্ণধন ছিলেন নাতিদীর্ঘ, ঋজুদেহ, শ্যামবর্ণ। তাঁর নয়নদ্বয় ছিল বৃহৎ। মুখের আকৃতি ছিল মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মুখের মতো। তিনি ছিলেন দৃঢ় ইচ্ছাশীল। তাঁর স্বভাব ছিল মধুর মতো মধুর।

কে. ডি. ক্যাম্বাল

খুলনার জনগণ 'দাতাকর্ণ কৃষ্ণধন ঘোষের প্রতি বিপুলভাবেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। খুলনাতে কৃষ্ণধনের নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের প্রতি প্রীতিমান সেই পুরুষ প্রবরের প্রতিকৃতি খুলনার টাউন হলের শোভা বর্ধন করত।

ডাক্তার কৃষ্ণধন এখনকার বাংলাদেশের রংপুরেও কয়েক বৎসর অবস্থান করেছিলেন।

তাঁর চিত্তের রমণীয়তা রংপুরবাসীদেরও মুগ্ধ করেছিল। তখন রংপুর শহরের একটি খালের নাম দেওয়া হ'ল 'কে. ডি. ক্যানাল'।

জলকে বলা হয় 'জীবন'। খালে জল থাকে—জীবন থাকে, এরূপ উক্তি ভ্রমপূর্ণ নয়। চিকিৎসকরূপে, কৃষ্ণধন ছিলেন মানুষের জীবনদাতা, তাপ বিমোচনকারী জলের মতো। তাই তাঁর নামে জলবাহী খালের নামকরণ বেশ যুক্তিযুক্তই বটে।

অরবিন্দের মাতা স্বর্ণলতা

কৃষ্ণধন ঘোষ মহোদয়ের পত্নীর নাম স্বর্ণলতা। স্বর্ণলতা ছিলেন যেন স্বর্ণ লতা।

অরবিন্দ স্বর্ণলতার মহাফল অপ্রতিম পুত্র।

মহিয়সী মহিলা স্বর্ণলতা ছিলেন নানা গুণে অলংকৃতা। তাঁর হৃদয়ে ছিল ভারত-ভক্তি। গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে তাঁর ছিল বিপুল অনুরক্তি।

লেখাপড়া যেন ছিল তাঁর দুইটি কন্যার মতো।

এই ধন্যা নারী পরে বুদ্ধিবৈকল্য বা মস্তিস্ক বিকৃতি রোগে আক্রান্ত হন। জীবন তখন আর তাঁর পক্ষে শান্তিবন হ'ল না।

রাজনারায়ণ বসু

মহীয়সী মহিলা স্বর্ণলতা ঘোষের পিতৃ-পরিচয় অতিশয় গৌরবময়।

সুবিখ্যাত রাজনারায়ণ বসু ছিলেন স্বর্ণলতা ঘোষের পিতা।

রাজনারায়ণের প্রকৃতি ছিল বজ্রের মতো কঠোর, কুসুমের মতো মৃদু।

রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা।

ভারত হতে ভয়-ভীতি-ভীরুতা চলে যাক, ভারতের জনগণের মধ্যে

ভ্রাতৃত্ব ভাব প্রভাব বিস্তার করুক, ভারত ভাতিময় হয়ে উঠুক,—এই ছিল রাজনারায়ণ বসুর বাসনা।

বিদ্যায় রাজনারায়ণ ছিলেন বিচক্ষণ। বাগ্মিতা ছিল তাঁর অন্যতম ভূষণ।

ভগবৎ-প্রীতি ও ভারত-প্রীতি রাজনারায়ণের জীবনে মূর্ত করে তুলেছিল অপূর্ব দীধিতি।

রাজনারায়ণ "হিন্দু সমিতি" প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ভারত হতে তখনকার বিদেশী শাসককে সাগর পারে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে তাঁর গোপন সমিতি গঠনের কথা আর গোপন নেই।

রাজনারায়ণ ছিলেন সুসাহিত্যিক। তাঁর বিরচিত গ্রন্থরাজি আজও ফুলের সাজির মতোই বিরাজ করছে।

রাজনারায়ণ বসু মহোদয়ের বিরচিত পুস্তকগুলির নাম কি ?

নাম—"সেকাল ও একাল", 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য", "সারধর্ম", "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব", "গ্রাম্য উপাখ্যান", ইত্যাদি।

রাজনারায়ণের সঙ্গ লোকের পক্ষে যেন ছিল সুধা সঙ্গ।

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,—সেই বিদ্যাসাগর, সেই দয়ার সাগর, আগমন করতেন নারায়ণ-প্রতিম রাজনারায়ণের সমীপে।

আগমন করতেন অক্ষয় সাহিত্য রচয়িতা অক্ষয়কীর্তি অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁরই পৌত্র হচ্ছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

রাজনারায়ণ বসু তাঁর কন্যা স্বর্ণলতাকে শক্তিতে ভগবতী ও বিদ্যায় ভারতী ক'রে তুলবার জন্য প্রযত্নশীল ছিলেন।

অপ্রতিম অরবিন্দের আবির্ভাব

মহতো মহীয়ান পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলুষ করাল কংস রাজার কারাগারে।

অপ্রতিম অরবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন পরাধীন ভারতে।

কোন্ সালে? কোন্ দিবসে? কোথায়?

অরবিন্দের আবির্ভাব হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট দিবসেই ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে।

কলনাদিনী গঙ্গার উপকূলবর্তী কৃষ্টি-কলা-কলকোলাহলময়ী কলিকাতা নগরী অরবিন্দ ঘোষের জন্মস্থান।

অরবিন্দের ভ্রাতা কয়টি? ভগিনী কয়টি?

অরবিন্দের ভ্রাতা তিনটি। ভগিনী একটি।

কৃষ্ণধন ঘোষ ও স্বর্ণলতা ঘোষের প্রথম পুত্রের নাম বিনয়ভূষণ; দ্বিতীয় পুত্রের নাম মনোমোহন; অরবিন্দ হচ্ছেন তাঁর মাতাপিতার তৃতীয় পুত্র; চতুর্থ পুত্রের নাম বারীন্দ্রকুমার। বারীন্দ্র কুমারের জন্মগ্রহণের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের ভগিনী। তাঁর নাম সরোজিনী।

বারীন্দ্র কুমারের নাম বারীন্দ্র কুমার কেন হল?

ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ এবং তাঁর পত্নী স্বর্ণলতা ঘোষ তাঁদের তিন পুত্র ও একমাত্র কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ভারত হতে ইংলণ্ড গমন করেছিলেন। তাঁরা তখন অর্ণবযানের আরোহী। চারিদিকে সমুদ্র উত্তাল—তরঙ্গের তুমুল তাল। সুদুস্তর অকূল পাথারে অর্ণবযান-মাঝারে জন্মগ্রহণ করলেন কৃষ্ণধন ও স্বর্ণলতার কনিষ্ঠ পুত্রটি। সমুদ্রকে বলা হয় বারীন্দ্র। বারীন্দ্র মধ্যে জন্ম হ'ল বলেই, ঐ ছেলেটির নাম-করণ করা হল বারীন্দ্রকুমার।

পরবর্তীকালে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ হয়েছিলেন স্বদেশসেবী বিখ্যাত বিপ্লবী।

শিশু অরবিন্দ কিরূপে বর্ধিত হয়ে উঠতে লাগলেন?

বর্ধিত হয়ে উঠতে লাগলেন ঠিক মাতৃক্রোড়ে তেমন নয়; এক ইংরাজ আয়ার ক্রোড়ে!

মাতৃ-মমতা দূর থেকে তাঁর প্রতি দৃষ্টি রাখতে লাগল।

অরবিন্দের অগ্রজ দুজনের শিক্ষার ভারও কোন ভারতীয়ের হাতে ন্যস্ত ছিল না; ছিল এক বিদেশীর হাতে। তিনি ছিলেন একজন ইংরাজ।

দার্জিলিং শৈলশহরে প্রাথমিক শিক্ষা

অরবিন্দ সমগ্র ভারতকে মহতী শিক্ষা দান করেছেন; সমগ্র পৃথিবীকে মহতী শিক্ষা দান করেছেন।

তাঁর শিক্ষালাভের ইতিহাস কিরূপ?

অরবিন্দের পিতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ অরবিন্দকে এবং বিনয় ভূষণ ও মনোমোহনকে নিজের চক্ষের দৃষ্টি সীমার মধ্যে রাখলেন না তাঁদের প্রেরণ করলেন দার্জিলিংয়ে পরদেশীদের পরিচালিত বিদ্যালয়ে। তার নাম লোরেটো কনভেন্ট স্কুল। সেটি ছিল আয়ারল্যাণ্ডের সন্ন্যাসিনীদের দ্বারা পরিচালিত।

সেই বিদ্যালয় ভারতেই অবস্থিত হলেও, বঙ্গদেশেই অবস্থিত হ'লেও, ভারতীয়ত্ব সেখানে নেই, বাঙ্গালীত্ব সেখানে নেই।

সেই লোরেটো কন্ভেন্ট স্কুলের ব্যবস্থা হল:

ইংরাজী বল, ইংরাজী শোন, ইংরাজী পড়;
ইংরাজী লেখ; ইংরাজী পোষাক পর;
ইংরাজী আচার-আচরণ ধর। যদিও
তুমি ইংরাজ নও, তবু তুমি ইংরাজ হও।

রাজনারায়ণ বসু ছিলেন সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবসমৃদ্ধ। কিন্তু রাজনারায়ণ-নন্দিনী-নন্দন বালক অরবিন্দ ঐরূপ অভারতীয় ভাবের মধ্যে বর্ধিত হতে লাগলেন। পক্ষান্তরে, আবার, দেখা যায় ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ অভারতীয় ভাবাপন্ন হলেও, কৃষ্ণধন-নন্দন অরবিন্দ,

বিচার-বিবেচনা-বোধ সমৃদ্ধ হয়ে উঠবার পর, তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল ভারতীয় ভাবভাণ্ডার।

লোরেটো কন্‌ভেণ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্র বালক অরবিন্দ তাঁর মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলতে সমর্থ হতেন না, এরূপ বলা যায়।

দার্জিলিংয়ে প্রবল শীতের আগমন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হত ঐ বিদ্যালয়ের সুদীর্ঘ ছুটি। অরবিন্দ এবং তাঁর ভ্রাতাদের তখন তাঁদের পিতা-মাতার নিকটে আগমন বড় হয়ে উঠত না। তাঁরা যেতেন মাতামহ রাজনারায়ণের নিকটে।

রাজনারায়ণ নিশ্চয়ই তাঁর দৌহিত্রদের চিত্তকে ভারতীয় চিত্ত ও পথ্য প্রদান করতেন।

হিমাদ্রি জগতের শ্রেষ্ঠ অদ্রি। শ্রীঅরবিন্দও কত দিক দিয়েই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠজন বালক অরবিন্দ দার্জিলিংয়ে অবস্থানকালে হিমাদ্রি সন্দর্শনে কবিতা রচনা করতেন। সেই কবিতা রসিকজনের চিত্তকে রসসিক্ত করতে সমর্থ হত। অরবিন্দের সেই কবিতা ছিল অরবিন্দ-উৎসারিত সৌরভের মতো।

অরবিন্দ এবং তাঁর অগ্রজদ্বয় দু'-তিন বৎসর কাল দার্জিলিংয়ের ঐ কন্‌ভেণ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

ইংলণ্ডের অরবিন্দের প্রবাসপর্ব

এবার অরবিন্দের প্রবাসপর্ব আরম্ভ। বয়স হয়তো হ'ল সপ্তবর্ষ।

ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ একদিন ভারতের উপকূল হতে অর্ণবযানে আরোহণ করলেন। তখন তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তাঁর পত্নী স্বর্ণলতা এবং সন্তানেরা।

সমুদ্রের তরঙ্গনাদ শ্রুত হতে লাগল। নীলাম্বু যেন করছিল কম্বুনাদ! প্রবলবেগে প্রবাহিত হচ্ছে পবন। ঊর্ধ্বে অনন্ত গগন করছে আলো উৎসারণ।

যথাকালে কৃষ্ণধন এবং তাঁর পরিবারবর্গ অর্ণবযান হতে অবতরণ করলেন। স্পর্শ করলেন ইংলণ্ড, যার রাজধানী হচ্ছে লণ্ডন।

ভারত-সুত অরবিন্দ তখন যা কিছু দর্শন করলেন, সেই সবই হচ্ছে অভারতীয়।

তাঁরা ম্যাঞ্চেস্টারে গমন করলেন।

কি উদ্দেশ্যে কৃষ্ণধন তখন বিলাত গমন করলেন? উদ্দেশ্য ছিল একাধিক: স্বর্ণলতা দেবী মস্তিষ্করোগে আক্রান্ত ছিলেন, তাঁর চিকিৎসা। পুত্রদের বিদ্যালাভের ব্যবস্থা। চিকিৎসা কর্ম দ্বারা কৃষ্ণধনের অর্থ উপার্জন।

ড্রুয়েট পরিবারে

ম্যাঞ্চেস্টারে তখন ছিলেন একজন ধর্মযাজক। তাঁর নাম ড্রুয়েট। তাঁর পত্নীও সেখানে ছিলেন।

কৃষ্ণধন তাঁর পুত্র ত্রয়কে সেই ড্রুয়েটদের গৃহেই রাখলেন। ড্রুয়েট দম্পতি ভারতীয় বালক ত্রয়কে পরম আপনজন ব'লে গণ্য করলেন।

অরবিন্দের অগ্রজদ্বয়ের বিদ্যালাভের ব্যবস্থা হ'ল স্থানীয় বিদ্যালয়ে।

অরবিন্দের শিক্ষালাভ চলতে লাগল ড্রুয়েট দম্পতির নিকট।

শ্রীমতী ড্রুয়েট অরবিন্দকে শিক্ষাদান করতে লাগলেন ইংরাজী ভাষা।

শ্রীড্রুয়েট কি শিক্ষাদান করতে লাগলেন? তিনি শিক্ষাদান করতে লাগলেন সুললিত ল্যাটিন ভাষা।

অনেক ভারত সন্তান বিলাতী বাতিকগ্রস্ত হয়েছেন; তাঁরা হতে চেয়েছেন বিলাতী বাতি, ভারতীয় ভাতি তাঁরা চান নি;—এরূপ দৃষ্টান্ত মোটেই দুর্লভ নয়।

বিনয়ভূষণ, মনোমোহন এবং অরবিন্দকেও বিলাতী বাতি করে তুলবার প্রয়াসও প্রচেষ্টা পূর্ণমাত্রাতেই চলতে লাগল।

বালক অরবিন্দের অসাধারণত্ব

ভারতের বহু সন্তান-সন্ততি অল্প বয়সেই বৃহৎ ভাব প্রদর্শন করেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত ভারতের বৈদিক যুগ হতেই দৃষ্ট হয়।

শ্রীকৃষ্ণ, নচিকেতা, আরুনি, একলব্য, প্রহ্লাদ, সত্যকাম, জাবাল, শ্রীচৈতন্য, শাক্য পুত্র রাহুল, নেতাজী সুভাষ, ওড়িশার বাজী রাউত, রাণী ভবানী, গুরুগোবিন্দ সিংহ, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, রাজা রামমোহন রায়, বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু, গোপাল কৃষ্ণ গোখ্লে, বাদশা ঔরঙ্গজেব, আসামের কনকলতা বড়ুয়া ইংরাজী "অমৃত বাজার পত্রিকা"র প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ, সাধক কমলাকান্ত, জগদীশ তর্কালংকার, আজাদহিন্দ ফৌজের বেলা দত্ত, শংকরাচার্য, "মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ" প্রণেতা বোপদেব, মেবারের শক্ত সিংহ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বদেশসেবক চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা, বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাধারণত শ্রদ্ধাভরে যাঁকে বলা হয় বাঘা যতীন, বুন্দেলখণ্ডের বীর ছত্রশাল, পণ্ডিত জবহরলাল নেহরু, ক্রোরীয়াল, গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী, বদান্য ব্যবসায়ী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে অল্পবয়সেই কোন না কোন প্রকার অপ্রতিম ভাব প্রদর্শন করেছেন।

বালক অরবিন্দও অসাধারণত্ব প্রদর্শন করতে লাগলেন—একাধিক প্রকার অসাধারণত্ব।—বালক অরবিন্দ ইংরাজের মতো নেকটাই বা গলাবন্ধ ঠিক মতো এঁটে নিতে পারে না; জামার বোতামও ঠিক মতো লাগাতে পারেন না। তিনি কাহারও সঙ্গে সঙ্গ করেন না, রঙ্গ করেন না, ব্যাঙ্গ বা মারামারিও করেন না।

তিনি ক্রীড়া করেন না; গৃহ হতে বাইরে বড় একটা বহির্গত হন না।

তাহ'লে বালক অরবিন্দ কি করেন?

তিনি ব'সে থাকেন ঘরের কোণে; ব'সে থাকেন আপন মনে, রত থাকেন অধ্যয়নে। পাঠ যেন তাঁর নাট; পাঠ যেন তাঁর রাজপাট!

তিনি নানারকম গ্রন্থ পাঠ করেন। সাধারণ গ্রন্থ নয়, অসাধারণ গ্রন্থ। সবাই দেখল, বালক অরবিন্দ ইতিমধ্যেই বিশ্বের বরণীয় বই বাইবেল পাঠ করে শেষ করেছেন। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেক্স্পিয়ার। তাঁর জুড়ি নেই আর। শেক্স্পিয়ারের রচনা যেন পিয়ার বা নাশাপাতির মতো প্রীতিপ্রদ। বালক অরবিন্দ সেই সব নাটকও পাঠ করেছেন। মনেও রেখেছেন।

ল্যাটিন ভাষা কোন শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু দেখা গেল, বালক অরবিন্দ, ল্যাটিন ভাষা খাসারূপে শিক্ষা ক'রে উৎপাদন করছেন সকলের বিস্ময়। ইংরাজী তো তাঁর কাছে যেন ফুলের সাজি!—সেটি যেন হয়ে গেছে তাঁর মনের পক্ষে একটা সাজ-ই!

যে সব পদ্য রচনা করেছেন মিল্টন, বায়রণ, কীট্স্ আর শেলী বালক অরবিন্দের মন সে সবের মধ্যে করে যেন কেলি।

কিন্তু দশ বছর বয়স্ক অরবিন্দ কেবলমাত্র পরের রচিত কবিতা-কুঞ্জেই কেলি করেন না।

তাহ'লে তিনি কি করেন?

তাঁর কলমও তখন কবিতা রচনা করে। তাঁর সেই পদ্য হয়ে ওঠে অনবদ্য। সেই ভারতীয় বালক পদ্য রচনা করেন ল্যাটিন ভাষায়, ইংরাজী ভাষায়। সেই পদ্য পাঠককে হর্ষে ভাসায়?

বালক অরবিন্দের ইংরেজী শিক্ষার দীপশিখা দর্শন করে শ্রীমতী ড্রুয়েট ভাবলেন, এই অ-খৃষ্টান, অ-বিলাতী ছেলে তো আমাদের সঙ্গে

ভাব করে ফেলেছে। এখন আমরা যদি একে খৃষ্টান করে নিতে পারি, তাহ'লে আমরা হব লাভবান। একে কি যিশুর অনুরক্ত ভক্ত করে নেওয়া যায় না ?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি দেখলেন, না, তা যায় না।

ড্রুয়েট পরিবারে বালক অরবিন্দের দিন কাটতে লাগল।

কত দিন কাটল ?

পাঁচ বৎসরে যত দিন হয়, তত দিন।

তারপর ?

তারপর কার্য-ব্যপদেশে ড্রুয়েটরা চলে গেলেন অন্যস্থানে। তখন তাঁরা অরবিন্দ ও তাঁর দুই ভ্রাতাকে রেখে গেলেন লণ্ডনে।

ওদিকে, অরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ইতিমধ্যে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেছেন সপরিবারে। ইংলণ্ডে অবস্থান করে, তাঁর কার্যের তেমন কোন সুযোগ-সুবিধে হয়নি। তাই তিনি তখন ইংলণ্ড ত্যাগ করেন।

একাদশেই এক আদর্শের উন্মেষ

অরবিন্দের বয়স একাদশ বর্ষ। তখন তাঁর চিত্তদেশে সঞ্জাত হ'ল এক হর্ষ।

তিনি অনুভব করলেন, এই ভবে অভিনব কিছুর আবির্ভাব হবে—একটা পরিবর্তন যেন আসন্ন।

একাদশ বর্ষীয় বালক মনে মনে সংকল্প করলেন, সেই পরিবর্তন-প্রবাহের মধ্যে তিনি পৌরুষ প্রদর্শন করবেন—সেই কার্যে তিনি আর্যোচিত ভূমিকা অবলম্বন করবেন।

বালক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, হয়তো মনে করলেন, তিনি হবেন শ্রীঅরবিন্দ।

ইংলণ্ডের লণ্ডনে বিদ্যানিকেতনে

ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন যেন ইংলণ্ডের লণ্ঠন!—আলোর লণ্ঠন।

ইংলণ্ডের যাহা কিছু ভালো, লণ্ডনে দৃষ্ট হবে তার আলো।

ম্যাঞ্চেষ্টারে বিদ্যা চেষ্টার পর, অরবিন্দ গেলেন লণ্ডনে। তখন তাঁর বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ।

লণ্ডনের একটি বিদ্যালয়ের নাম সেণ্ট পল্‌স্ স্কুল।

সেণ্ট পল্ কি?

সেণ্ট পল্ সুবিখ্যাত সুমহান খৃষ্টান সাধু। তাঁর উপদেশরাশি অতি সুস্বাদু।

অরবিন্দ ভর্তি হলেন সেণ্ট পল্‌স্ বিদ্যালয়ে। সুমহান সাধুর নামাঙ্কিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলেন ভবিষ্যতের এক সুমহান সাধু।

তাই দেখে দেবতারা হয় তো অলক্ষ্যে বললেন, সাধু, সাধু!

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছিলেন গ্রীকভাষায় ভালো রকম লব্ধবিদ্য। তিনি তাঁর বিদেশী ছাত্র অনুপম অরবিন্দের প্রতি প্রীতিযুক্ত হলেন। অরবিন্দকে গ্রীক ভাষা শিক্ষা দিতে লাগলেন।

গ্রীকভাষা অতি ভাসময়ী ভাষা। মহাকবি হোমারের মহাকাব্য ইলিয়াড, মহাকাব্য ওডিসি; এস্কাইলাস, সোফোক্লিস এবং ইউরিপাইডিস এর নাটক;—সেই সবই গ্রীকভাষা ভাণ্ডারে আলোক সঞ্চারে।

কিশোর অরবিন্দ গ্রীক ভাষা খাসারূপেই আয়ত্ত করতে লাগলেন। শিক্ষকদের বিস্মিত করে দিলেন!

ইংরাজী, ল্যাটিন, গ্রীক বেশ করে শিক্ষা হল। এইবার ফরাসী ভাষাও বাদ রইল না। ফরাসী ভাষা যেন ফুরফুরি হাওয়া। যত যায় পাওয়া, ততই যায় চাওয়া!

অল্প বয়স্ক অরবিন্দ তখন হলেন চারিটি বিদেশী ভাষায় চমৎকার পেই পটু।

তাই দেখে,সবাই অবাক। কিন্তু অরবিন্দ মিত-বাক।

কেবল ঐ চারিটি নয়, আরও কয়েকটি ভাষা অরবিন্দ তখন শিক্ষা রলেন। স্প্যানিস ভাষা, জার্মান ভাষা এবং ইটালিয়ান ভাষা-জ্ঞানে তনি কিছু কিছু ভূষিত হলেন।

চৌদ্দ বর্ষ বয়স্ক অরবিন্দ পটুতা প্রদর্শন করতে লাগলেন চৌদ্দার্ধ াষায়—সাতটি ভাষায়।

ঐরূপ প্রতিভা কি পৃথিবীতে প্রায়ই পাওয়া যায় ?

পাওয়া যায় না। অরবিন্দ যেন প্রতিভা-পারাবার।

পদ্য রচনায় ও পরীক্ষায় প্রথম স্থান

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রীক ভাষায় ও ল্যাটিন ভাষায় বিতা রচনার প্রতিযোগিতা হ'ল।

প্রথ পুরস্কার কে পেল ?

ইংরাজের দেশে বিদেশী বালক অরবিন্দ।

বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রথম স্থান কে লাভ করল ?

অরবিন্দ।

প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও অরবিন্দই লাভ করলেন শীর্ষস্থান। ংসাপ্রসূনে হলেন শোভমান। পারিতোষিক লাভ করলেন। ত্তি লাভ করলেন।

অর্থাভাবে আর্ত

বিদ্যাশিক্ষার্থী অরবিন্দ বিদ্যাভাবে বিভোর ছিলেন। নানাবিধ ই পাঠ করতে করতে কোন কোন দিন, হয় তো, রাত্রি ও ভোর হয়ে ত।

কোন প্রকার বিলাসিতা তাঁর ছিল না। আহার-বিহার ছিল একমাত্র মহাব্রত।

কিন্তু স্বদেশ হতে সুদূরে সেই বিদেশে তাঁর অর্থাভাব দেখা দিল। তিনি যেন দুরারোগ্য দারিদ্র্য ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হলেন।

তখন তাঁর অবস্থা হল,—ক্ষুধাগ্নি নিবৃত্ত করার উপযুক্ত আহার, শৈত্যের প্রকোপ পর্যুদস্ত করার উপযুক্ত পরিচ্ছেদ, সামাজিক মান-সম্ভ্রম অক্ষুন্ন রাখার পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ, পুস্তক ক্রয় করে পাঠ করে মনের পুষ্টি বিধান,—অর্থাভাবে, এই সব তাঁর রীতিমতো হয়ে উঠছে না।

অর্থাভাবের কারণ হ'ল, অরবিন্দের পিতা পুত্রদের নিকট উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করতে পারছিলেন না। তার কারণ, সংসারের জন্ম অর্থব্যয় এবং অভাবগ্রস্ত নানা জনের প্রয়োজন পূরণ করার পর ইংলণ্ডে অবস্থিত পুত্রদের নিকট প্রেরণ করবার মতো অর্থ তাঁর মোটেই উপার্জন হচ্ছিল না।

সেই সুদূর বিদেশে অরবিন্দ এবং তাঁর দুই ভ্রাতার তখন ক্লেশ আর ক্লেশ।

স্বাস্থ্য সুস্থ থাকছে না; মান-সম্মান বজায় থাকছে না। দুশ্চিন্তা এসে আক্রমণ করছে।

কর্তব্য সম্পাদনে ব্যাঘাত হচ্ছে।

দারিদ্র্যের অনেক দোষ। দারিদ্র্য মানুষের জীবনকে দড়ির মতো তুচ্ছ ক'রে তোলে; দারিদ্র্য মানুষের মনুষ্যত্বকে শূন্যগর্ভ ক'রে তোলে।

প্রাচীন কালের বিজ্ঞজনেরা সংস্কৃত ভাষায় বলেন, দারিদ্র্য দোষ মানুষের গুণরাশি নাশ করেন—মানুষের অন্তর্নিহিত গুণরাশির বিকাশের দ্বার রোধ করে দাঁড়ায় দারিদ্র্য।

সংস্কৃত ভাষায় আবার বলা হয়েছে।

উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দারিদ্রাণাং মনোরথাঃ।

দরিদ্র লোকদের মনের বাসনাগুলো হৃদয়ে তরঙ্গের মতো উত্থিত হয়; আবার হৃদয়-মধ্যেই লয়-প্রাপ্ত হয়—দরিদ্র জন তাঁর মনোরথ অনুসারে কর্ম সম্পাদনে সমর্থ হয় না। কারণ কর্ম-সম্পাদনের মতো অর্থ তার নেই।

দারিদ্র্যের-দরিয়ায় পতিত হলে, মানুষের জীবন শুধু হাবুডুবু খায়; মর্যাদার কৌলিন্যের কূল প্রাপ্ত হওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়।

দারিদ্র্য যে কেবলমাত্র সুকর্ম সম্পাদনেই বাধা দান করে, তা নয়।

দারিদ্র্য মানুষকে দুষ্কর্ম সম্পাদনের পথে প্রচলিত করে। দরিদ্র মানুষ অসদুপায় অবলম্বন করে,—সৎপথ বর্জন করে।

বিশ্বসমাদৃত সংস্কৃত ভাষায় কথিত হয়েছে, বুভুক্ষু ব্যক্তি—ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কোন্ পাপকর্ম না করে?

ধীরভাবে লক্ষ্য করলে, দেখা যায়, মানুষের দারিদ্র্যের জন্যেই মানুষ অনেক অপকর্মের অনুষ্ঠান ক'রে থাকে।

সুতরাং দারিদ্র্য যে মানুষের-জীবনে কিরূপ দস্যুর কাজ করে, তা বুঝতে বিলম্ব হয় না।

অরবিন্দ এবং তাঁর দুই ভ্রাতা বিদেশে অবস্থান কালে সেই দারিদ্র্য দ্বারা আক্রান্ত হয়েও, তিন ভাই দ'মে গেলেন না। অর্থ উপার্জনের জন্য অনর্থের পথ অবলম্বন করলেন না।

মহাকবি কালিদাস সংস্কৃত ভাষায় বলেছেন,

বিকারের কারণ থাকা সত্ত্বেও, যাঁদের হৃদয়বিকার প্রাপ্ত হয় না, তাঁরাই ধীর।

ডাঃ কৃষ্ণধনের তিন পুত্রও অভাবের মধ্যেও সৎভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হলেন।

তাঁরা তখন, হয় তো স্মরণ করলেন কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রাণপ্রদ বাণী:

পরের অভাব মনে করিলে চিন্তন,

আপন-অভাব-ক্ষোভ রহে কতক্ষণ!

—অভাব যখন এসে আমাদের জীবনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় অভাব জনিত ক্ষোভ যখন আমাদের জীবনকে ক্ষয় করতে চায়—তখন যদি আমরা মনে করি, আমাদের মতো অভাব-গ্রস্ত মানুষ পৃথিবীতে অনেকই তো রয়েছে, তা হ'লে, অভাবের সময়েও সান্ত্বনা লাভ ক'রে, আমরা কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে থাকতে পারি।

অর্থাভাবগ্রস্ত অরবিন্দও তখন চিন্তা করলেন সেইরূপ। অভাবগ্রস্ত কোটি কোটি মানুষের রূপ তাঁর হৃদয় দর্পনে প্রতিফলিত হ'ল।

অরবিন্দ ভাবলেন, সুখ সুখ ক'রে ক্রন্দন ক'রে, সময় ব্যয় করে কি লাভ হবে! যারা দুঃখী, সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা করব তাদের করতে সুখী। তাহাতেই লব্ধ হবে প্রকৃত সুখ; জব্দ ও স্তব্ধ হয়ে যাবে যাবতীয় দুঃখ।

অর্থাভাবের সংকটটাকেই সংকটে পাতিত করাবার জন্য, অরবিন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিনয়ভূষণ লণ্ডন শহরের একটি ক্লাবে চাকরি গ্রহণ করলেন।

অরবিন্দও অর্থ উপার্জন বিষয়ে নিষ্ক্রিয় রইলেন না। নানারূপ প্রবন্ধ রচনা করে অর্থ উপার্জনের উপায় অবলম্বন করতে সচেষ্ট হলেন।

অভাব তাঁদের জীবনযাত্রাকে একেবারে পঙ্গু করে দিতে পারল না।

মানুষ জীবনে সৎভাব অবলম্বন করে নানারূপ বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে যে সংগ্রাম, তাহাই জীবনকে ক'রে তোলে অভিরাম।

স্বদেশ-চিন্তা—ভারত-ভাবনা

পরবর্তীকালে ভারতের ভাতিভাস্বর অরবিন্দ তখন ভারত হতে দূরে বহুদূরে ইংলণ্ড দ্বীপে। ভারতের দীপ সেখানে নেই।

অরবিন্দ তখন কাদের মধ্যে?

তখন যে বিদেশীরা ভারতের শাসক ও শোষক, অরবিন্দ তখন তাদের মধ্যে।

সেখানে অরবিন্দের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিরূপ?

ভারতে যে রূপ, সেরূপ নয়! অন্যরূপ।

ভারতীয় শিক্ষার শিখা অরবিন্দ সেখানে দর্শন করতে পান না।

তথাপি, মরু-কান্তার-পর্বত-পারাবার পার হয়ে, ভারতের ভাতি একদা সুদূরস্থিত ভারত সন্তানের ছাতি স্পর্শ করল—বক্ষ-কক্ষে প্রবেশ করল।

অরবিন্দ ফুল্লার বিন্দ বন্দিত ভারতের ভাবনার ভাব প্রাপ্ত হলেন।

কিরূপে তা হল?

কিরূপে তখনকার পরাধীন ভারতের ভাতি-হীনতার ছবি ভারতের ভাবী কবির অন্তর-অমরাবতীতে মূর্ত হয়ে উঠল?

"বিপ্লব পরাধীনতা-উত্তরণ-প্লব"

অরবিন্দের পিতা ভিষক কৃষ্ণধন ঘোষ তাঁর পুত্র অরবিন্দের নিকট তাঁর মানস সরোবরের অরবিন্দপ্রতিম অরবিন্দের নিকট-পত্র প্রেরণ করতেন। সেই সব পত্র ছিল তখনকার ভারত সম্বন্ধীয় সন্দেশসত্র। ভারতের অবস্থার এবং ভারতের দুরবস্থার বিবরণ সেই পত্রে ছত্রে ছত্রে লিপিবদ্ধ থাকত।

তখনকার ভারতীয়দের সম্পাদনায় যে সব পত্রিকা প্রকাশিত হত, সেই সব পত্রিকায় মুদ্রিত থাকত দুঃখ ভাবাবনত ভারত-জীবনের বিবরণ। কৃষ্ণধন সে সবও অরবিন্দের নিকট প্রেরণ করতেন। সেই সব পত্র পত্রিকা পাঠে, অল্পবয়স্ক অরবিন্দ জানতে পারতেন, ভারতের অবস্থা যেন একটা দুরবস্থার বস্তা।

তখনকার ভারত পরাধীনতায় পোড়া; বিদেশীর শোষণে শুষ্ক; বিদেশীর বিদ্বেষ-বিষে মুমূর্ষু।

অরবিন্দের অরবিন্দপ্রতিম চিত্ততলে তখন চিন্তার তরঙ্গ উদ্ভূত হত: ভারত কেন পরাধীন? কি কর্ম করলে, ভারত হতে পারে স্বাধীন?

আমি এখন এই যে দেশে আছি, সে দেশতো স্বাধীন।—ভারত কেন পরাধীন?

ভারতের স্বাধীনতার জয় ডিণ্ডিম করে কবে ধ্বনিত হয়ে উঠবে? কে বাজাবে? কাহারা বাজাবে? কি রকমে বাজাবে?

কবে দেখা যাবে, ভারতের স্বাধীনতার আনন্দমাখা পতাকা ব্যোম-মণ্ডল বিমণ্ডিত করে শোভমান হয়েছে?

অরবিন্দ তখন বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন।

সেই সব ইতিহাসে তিনি দেখেছেন, পরাধীন দেশের স্বাধীনতাকামী বীর সন্তানদের হাতের আগুন তাঁদের দেশের পরাধীনতাকে করেছে খুন।—প্রভুদের নিকট আবেদন নিবেদন ক'রে, দেশের পরাধীনতার অবসান ঘটানো সম্ভব হয়নি।

অন্যায়কে নিবয়ে প্রেরণ ক'রে, ন্যায়ের আলোক-আসন প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র প্রহরণ পথেই সম্ভবপর।

সংগ্রাম-পথে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাহিনী দিয়েই রামেরকাহিনী—রামায়ণ।

পাণ্ডবদের হস্ত অস্ত্র ধারণ ক'রে হয়ে উঠেছে ব্যস্ত। কেবলমাত্র তখনই তাঁরা হতে পেরেছেন স্বস্থ ও সুস্থ।—এই কাহিনী দিয়েই মহাভারতের মহাভারত।

অস্ত্রধর হস্ত রক্ষা করে দেশের ও জাতির অন্ন-বস্ত্র।

ঐরূপ চিন্তার রূপে প্রমূর্ত হতে লাগল অল্পবয়স্ক অরবিন্দের নেত্রপথে।

বিজ্ঞতা তাঁকে বলতে লাগল, তোমার স্বদেশের অবস্থা বোঝ, তার পরে যোঝ। যারা হয় যুযুধান, তারাই রক্ষা করতে পারে দেশের ধন-মান। পরাধীনতার পাপ পারাবার উত্তরণে বিপ্লব হচ্ছে প্লব—ভেলা।

অতি তরুণ অরবিন্দের মন প্রহরণ-পথে ভারতের স্বাধীনতা ভাতি উদ্ধারে উদ্বুদ্ধ হয়ে গেল।

শিক্ষার সুউচ্চ স্বর্ণমঞ্চ অভিমুখে

তরুণ-অরুণ অরবিন্দ ক্রমেই শিক্ষার সুউচ্চ স্বর্ণমঞ্চ অভিমুখে উত্থান করছেন।

লণ্ডনে সমাপ্ত হল অরবিন্দের ছাত্রজীবনের পবিত্র অধ্যায়। এইবার তিনি আগমন করলেন কেম্ব্রিজে। কেম্ব্রিজের কিংস কলেজ—কলেজ সমূহের মধ্যে অতিশয় কুলীন—বিদ্যাবিবর্ধনের জন্য বিখ্যাত। অরবিন্দ সেই কলেজের ছাত্র হলেন। তখন তাঁর বয়ঃক্রম বিংশতিবর্ষ অপেক্ষাও কম।

অরবিন্দ তখনও দারিদ্র্যের মধ্যেই বলা যায়। কিন্তু দারিদ্র্য তাঁর হৃদয়কে দরিদ্র করে তুলতে সমর্থ হয়নি।

তিনি ট্রাইপস্ পরীক্ষা প্রদানের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

কিংস কলেজের ছাত্ররূপে তাঁর একটি বর্ষ হর্ষ সহকারেই অতিবাহিত হ'ল। তিনি যে সকল বিষয়ের পরীক্ষা দিলেন, সেই সকলের প্রত্যেকটিতেই তিনিই প্রাপ্ত হলেন প্রথম স্থান। প্রশংসার

প্রাচুর্যে হলেন শোভমান। সেই সকল পরীক্ষায় সর্বাধিক উৎকর্ষ প্রদর্শনের সকল পারিতোষিক অরবিন্দ ঘোষ প্রাপ্ত হলেন পুষ্পবৎ।

ইংরাজ ছাত্ররা তখন সেই ভারতীয় কালা আদমীটির দিকে তাকায়, আর নিজেদের মধ্যে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করেঃ এই কালা আদমী তো দেখছি আলা আদমী!—এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায়, আমাদের মান-ইজ্জত যে যায়!

কলেজে কাব্য রচনার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ল। ভারতপুত্র আদি কবি বাল্মীকির অনুজ কবি অরবিন্দ সেই কাব্য প্রতিযোগিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানটি অধিকার করলেন।

সেই দৃশ্য দর্শনে ইংরাজ ছাত্রদের বদনে তখন আর বাক্ নেই।—তখন তাদের বিস্ময় অতিশয়।

তারা তখন করে বলাবলি – কি আর বলি! কি আর বলি!—এই ভারতীয় ছাত্র—এ তো অসাধারণ পাত্র!

অরবিন্দ ক্লাসিকাল ট্রাইপস্ পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট প্রথম অংশটার পরীক্ষা দিলেন। সেই পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তিনিই হলেন প্রথম স্থানাধিকারী।

প্রথম হওয়া, প্রশংসা পাওয়া, পুরস্কার পাওয়া, এই হ'ল অরবিন্দের অরবিন্দ জীবনের পাথেয়।

অরবিন্দের অপ্রতিম প্রতিভাদর্শনে, তাঁর অধ্যাপক একদিন তাঁকে বললেন, বৎস, আমি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করছি এই ত্রয়োদশ বৎসর কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমার নয়ন করেনি দর্শন তোমার মতো প্রতিভাধর! তুমি বিদেশী কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তুমি আমার স্বদেশী।

কেম্ব্রিজে ভারতীয় মজলিশে

ঐ সময়ে কেম্ব্রিজে যে সব ভারতীয় যুবক অবস্থান করছিলেন, কেম্ব্রিজে তাদের একটি মিলনসমিতি ছিল। সে যেন এক মৌচাক। তার নাম ছিল ভারতীয় মজলিশ।

বিদ্যাবারিধিমধ্যে সততসঞ্চরণশীল অরবিন্দ সেই ভারতীয় মজলিশে প্রবেশ করলেন। অরবিন্দকে নিজ মধ্যে প্রাপ্ত হয়ে, ভারতীয় যুব জনদের মনে হ'ল, তারা যেন বিলেতে বসেও ভারত-সরোবরের অরবিন্দকেই পেল! অরবিন্দকে তারা করলেন ভারতীয় মজলিশের সম্পাদক।

ঐ মজলিশের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ প্রজ্জ্বলিত করলেন স্বদেশ প্রেমের পাবক। তখন পরাধীনতার পাষাণ পেষণে পিষ্ট, এবং পরদেশীদের শোষণে ক্লিষ্ট ভারতের দুঃখ দৈন্যের মর্মন্তুদ কাহিনী অরবিন্দবদন হতে প্রকাশিত হতে লাগল সকলের সম্মুখে এবং প্রবেশ করতে লাগল সকলের বুকে।

ভারত দেশ অতি বিরাট। সে কেন হবে না স্বরাট।

ভারতের জনসংখ্যা সুবিপুল।—তাকে কি ক'রে অধীন ক'রে রাখছে ক্ষুদ্র জন্ বুল্!

ভারত-সন্তানগণের হাতে হাতে কেন নেই হাতিয়ার? ভারত কেন ধারণ করে না পরাধীনতা উত্তরণ-তরবার?

ভারতের ইতিহাস শূরত্বের ইতিহাস! সেই ভারত কেন আজ বিদেশীর দাস?

ভারত একদা করেছে দিগ্‌বিজয়। এখন কি কারণে সে বিজিত হয়ে রয়?

ভারত চিরকাল অগ্নির উপাসক। ভারতের আগুন অধুনা কেন প্রকাশিত করে না আপন স্তন?

ভারতের আগুন পরাধীনতাকে কেন করে না খুন ?

অনলই প্রকৃত পক্ষে বল। প্রজ্জ্বলিত হউক ভারতের অনল ! সেই অনল ভারতের পরাধীনতার পাশকে পাঁশে পরিণত ক'রে তাকে প্রাপ্ত করাক রসাতল !

ভারতের তরবারি ক'রে উঠুক ঝন্‌ঝন্ !—ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক ভারতের পরবশতার বন্ধন !

ভারতের কোটি কোটি কণ্ঠে বাজুক ডিণ্ডিম : আমরা ভারতকে করব স্বাধীন !—আমরা ভারতকে করব স্বাধীন।

বাজুক ভেরী ! বাজুক তূরী ! আইস, সকলে আমরা আস্তনের গোলা ছুড়ি ! পরাধীনতা-পাপ যাক পুড়ি।

ঐরূপ ভাব প্রকাশিত হতে লাগল অরবিন্দের অরবিন্দ-বদনের বাণীরাশির মধ্যে।

অরবিন্দের যৌবন বিলাসের পাশে পড়ে থেকে প'চে যেতে চাইল না ; বিলাসের বিলে লীলা-খেলা ক'রে একটা মাটির ঢেলায় পরিণত হয়ে যেতে চাইল না।

অরবিন্দ তখনকার সেই ভারতীয় মজলিশের মজ্জায়-মজ্জায় ঐ মহাভাবই অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিতে চাইলেন। মজলিশ যাতে শুধু একটা মজার আড্ডায় পরিণত না হয়। পরাধীন জাতির মানুষের যদি কোন মজলিশ থাকে, তবে সে মজলিশ একটা মজার মজলিশ হবে না ; সে মজলিশ হবে স্বাধীনতার সাধনার মজলিশ, এই তিনি চাইলেন।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (আই. সি. এস.)

দেখা গেল, অরবিন্দ তখন অরবিন্দ হয়ে উঠছেন !—ভারতবর্ষের বা অজনাভবর্ষের অজ হয়ে তিনি বিকশিত হচ্ছেন।

ঐ অবস্থায় অরবিন্দ কেম্ব্রিজ হতে আবার লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কেম প্রত্যাবর্তন করলেন?

আই. সি. এস. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য।

আই. সি, এস, পরীক্ষা তখনকার ইংরাজশাসনাধীন ভারতে ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলাশাসক হওয়ার পরীক্ষা।

অরবিন্দ যথা সময়ে আই. সি, এস. পরীক্ষা দিলেন।

গ্রীক ভাষার পরীক্ষায় এবং ল্যাটিন ভাষার পরীক্ষায় অরবিন্দ প্রমাণিত ক'রে দিলেন, যে ঐ দুই পরীক্ষায় কেহই কোন দিন তাঁর মতো পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়নি।

অরবিন্দ সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

কিন্তু তখনও আরও একটি পরীক্ষা প্রদান করতে হবে। সেই পরীক্ষা হচ্ছে অশ্বারোহণে পটুতা প্রদর্শনের পরীক্ষা।

অরবিন্দ সেই পরীক্ষাটির ব্যাপারে কি করলেন?

দেখা গেল, তিনি সেই পরীক্ষা প্রদান করবার জন্য সুনির্দিষ্ট দিনে সুনির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা প্রদান ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

ইচ্ছা পূর্বকই তিনি অনুপস্থিত হলেন। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল সেই পরীক্ষার কথা। কিন্তু তিনি ছিলেন নির্বিকার।

সেই আই. সি. এস. পরীক্ষা ছিল ভারতে ইংরাজের অধীনে দাসত্ব করার যোগ্যতার পরীক্ষা। সেই হেতুই কি অরবিন্দ সে পরীক্ষায় উপস্থিত হলেন না?

অরবিন্দের জীবন তখন স্বাধীনতার সাধনায় পক্ষ বিস্তার করছে —তিনি কি তখন আর দাসত্বগ্রহণের পরীক্ষা দিতে পারেন!

কোন মহাসত্ত্ব কি বরণ করতে পারেন দাসত্ব।

অরবিন্দ হলেন না ইংরাজশাসকের দাস।

যাঁর পক্ষে করা প্রয়োজন স্বদেশের স্বাধীনতা হীনতার নাগপাশ নাশ,—যাঁর পক্ষে সৃষ্টি করা প্রয়োজন তাঁর স্বদেশ বিদ্বেষী বিদেশীর চিত্তে মহাত্রাস—তিনি কি হতে পারেন তাদের দাস।

ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তখন হয়তো, অরবিন্দের দিকে দৃষ্টি প্রদান ক'রে ব'লে উঠেছিলেন, সাবাস, সাবাস!

বাঙ্গালীযুবকের বাঙ্গালা বর্ণপরিচয়

বাঙ্গালী অরবিন্দ বাঙ্গালা বর্ণজ্ঞান কখন লাভ করেছিলেন?

শৈশবে কি?

না।

যুবক অরবিন্দ যখন আই. সি. এস. পরীক্ষা প্রদানের জন্য প্রস্তুত হতেছিলেন, তখন তিনি বাংলা বর্ণ বা অক্ষর প্রথম চিনেছিলেন। অরবিন্দকে বাংলা অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়েছিলেন।

অতঃপর, অরবিন্দ শ্রান্তিহীন স্বকীয় সাধনাবলে বাংলা ভাষা কিছু কিছু শিক্ষা করলেন।

বঙ্গ-ভারতীর ভাতিস্নাত হতে তাঁর আকাঙ্ক্ষা বর্ধিত হতে লাগল।

ঐ পরীক্ষার জন্য বাংলা লেখাপড়া একটু জানা তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল।

কে তাঁকে বাংলা অক্ষর শিখিয়েছিলেন?

এক ব্যক্তি, ভারতে জজের কার্য সম্পাদন করার পর, ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বাংলা অতি সামান্যই জানতেন। তিনিই অসামান্য অরবিন্দকে বাংলা অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত করেছিলেন।

অতঃপর, অরবিন্দ শ্রান্তিহীন স্বকীয় সাধনাবলে বাংলাভাষা কিছু কিছু শিক্ষা করলেন।

বঙ্গ-ভারতীর ভাতিস্নাত হতে তাঁর আকাঙ্ক্ষা বর্ধিত হতে লাগল।

জাগৃতির গুপ্ত সমিতি

ঐ সময়ে যে সকল ভারতসন্তান লণ্ডনে করছিলেন অবস্থান, তাঁদের মধ্যে কতিপয় ভারত-ভাবুক এক গুপ্ত-সমিতি সংগঠিত করেছিলেন।—তাঁরা মাতৃভূমি ভারতকে বিদেশীদের দাসত্ব হতে মুক্ত করবার সাধনায় মগ্ন ছিলেন। তাঁরা ছিলেন বিপ্লববাদী—অগ্নিবলে বা অস্ত্রবলে তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা উদ্ধার করতে হয়েছিলেন দৃঢ়সংকল্প।

সেই বিপ্লববাদীদের সেই গুপ্ত সমিতির নাম ছিল "Lotus and Dagger"।—নামটি ছিল চমৎকার। বঙ্গভাষায় ঐটিকে কি ব'লে অভিহিত করা যায়?

"পদ্ম ও প্রহরণ" ব'লে অভিহিত করা যায় কি?

"Lotus and Dagger" গুপ্ত সমিতির সদস্যরা বলতেন, 'বিদেশী প্রভুর কৃপার পথে ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হতে পারে না। ভারতের স্বাধীনতার জন্য চাই কৃপাণ—যে কৃপাণ পরাধীনতাকে করবে খান খান।'

অরবিন্দ এবং তাঁর ভ্রাতৃদ্বয় সেই গুপ্ত সমিতির সদস্য হলেন।

পরাধীনতায় যারা সুপ্ত, তাদের জাগৃতির জন্য সেই গুপ্তসমিতি প্রয়োজন যাঁরা অনুভব করেছিলেন, তাঁরা যে ভারতের ভাল ছেলে ছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় থাকে কি?

ভারতের ছেলে এল ভারতের কোলে

বিলাতী আই. সি. এস. পরীক্ষায় পূর্বোক্ত ঘোড়ার ঘটনার ফলে, অরবিন্দ আর পরাধীন ভারতে জেলাশাসকের পদে নিযুক্ত হলেন না।

তখনতো তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তন করাই যুক্তিযুক্ত।

তাঁর পিতা ভিষক কৃষ্ণধন পত্র প্রেরণ করলেন: পুত্র, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কর।

অরবিন্দ এতদিন বিদ্যাচিন্তা করেছেন। এইবার তো অর্থচিন্তা স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর, অরবিন্দকে অর্থ অর্জন করতে হবে। কিন্তু কি পন্থা অবলম্বন ক'রে অর্থ অর্জন করবেন? সে চিন্তাও এসে যায়।

ঐ সময়ে, পরাধীন ভারতে বরোদা ছিল করদ মিত্ররাজ্য। বরোদার মহারাজার নাম ছিল সয়াজি গাইকোয়াড়।

সয়াজি গাইকোয়াড় ঐ সময়ে শ্বেতদ্বীপে বা ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি তখন একজন বিদ্বান, চরিত্রবান ও কর্মদক্ষ কর্মী চাইছিলেন তাঁর রাজ্যে উচ্চপদে কর্ম করবার জন্য।

কটন নামক একজন ইংরাজ হয়ে গিয়েছিলেন অরবিন্দের কুটুম্ববৎ। বরোদা রাজের সঙ্গেও কটনের পরিচয় ছিল।

একদিন কটন অরবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে গমন করলেন গাইকোয়াড়ের সন্নিধানে। সেখানে অরবিন্দ এবং বরোদারাজের মধ্যে নানারূপ আলাপ-আলোচনা হল।

বরোদার রাজা লক্ষ্য করলেন, অরবিন্দের হৃদয়ের রূপ যেন অমৃত-রূপ; বিদ্যায় তিনি যেন বারিধি; চিন্তায় তাঁর চিন্ময়তা।

বরোদারাজ বললেন অরবিন্দকে, "বরোদা আপনার মতো বরেণ্য ব্যক্তিকে চায়।"

অরবিন্দ বরোদা রাজ্যে কর্মগ্রহণে সম্মত হলেন।

আনন্দ-অব্দ

ভারতের ভাতিমান ভানুবৎ অরবিন্দ এইবার ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য সমুৎসুক হলেন।

সেইটি কোন্ খৃষ্টাব্দ?

ঐ অব্দে ভারতের ভাবী অরবিন্দ শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বিদেশ হতে

ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন।—ভারতের ছেলে এল ভারতের কোলে।

অরবিন্দ তখন বিপুল বিদ্যবিত্তবান।

অরবিন্দের চিত্ত তখন ভারতের স্বাধীনতা-সাধনায় যুযুধান।

ঐ অব্দ ভারতের পক্ষে এক আনন্দ-অব্দ। কেন আনন্দ অব্দ?

আনন্দ সম্বন্ধে উৎপনিষদের দিব্য বাণী অদ্যাপি বিঘোষিত হচ্ছে:

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে;
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি;
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

—আনন্দ হতে এই ভূত সকল সমুদ্ভূত হয়; যারা সমুদ্ভূত হয়, তারা আনন্দে প্রবেশ করে।

জীবের চিত্ত দেশে ভয়-ভাব বর্তমান থাকে। সেই ভীতি কিসে দূরীভূত হয়? আনন্দ-প্রবাহে।

উপনিষদের বাণী ঐ সম্বন্ধে এইরূপ:

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চ॥

—মনের সঙ্গে বাক্য যাঁকে না প্রাপ্ত হয়ে যাহা হতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জেনেছেন, তিনি কোন কিছু হতেই ভয় প্রাপ্ত হন না।

ঐ অব্দে ভারতের ভাস্বর সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদের ঐ আনন্দ-বাণী বিশ্বক্ষেত্রে বপন করার জন্য স্বদেশ হতে বিদেশে গমন করেন; আর অরবিন্দ বিদেশ হতে ভারতে আগমন করেন হৃদয়-দেশে ভারত-ভাবের আনন্দ নিয়ে; ভারতে স্বাধীনতা-সঞ্চার-সংগ্রামের শৌর্য নিয়ে।

ভারত-স্পর্শ-হর্ষ

অরবিন্দের বয়ঃক্রম তখন একবিংশতি বর্ষ।

অরবিন্দ ইংলণ্ড হতে অর্ণবযানে আরোহণ করলেন।—ইংলণ্ড ত্যাগ করলেন।

ইংলণ্ড বা গ্রেট বৃটেনের আর একটি নাম হচ্ছে Albion—অ্যাল্‌বিয়ন্। Albion শব্দটি ইংরাজী কবিতায় ব্যবহৃত হয়।

অর্ণবযানে অরবিন্দের আরোহণের পর, অ্যাল্‌বিয়নের আলো ক্রমেই অরবিন্দের পশ্চাতে পড়তে লাগল।

অনন্ত জলধি মধ্যে অবস্থিত অরবিন্দের অন্তর তখন দূরান্তরে অবস্থিত অজানা ভবর্ষের বা ভারতবর্ষের আলোক চায়; তাঁর নেত্রদুটি তখন সেই আলোকের জন্য সুদূর দিক্‌চক্রবালে ধায়।

দিন চলে, রাত চলে।

জাহাজও চলে। কল্লোল উত্থিত হয় অম্ভোধির জলে। ভারত-ভাব সমুত্থিত হয় অরবিন্দের চিত্ত তলে।

অর্ণবযানের চারিদিকে বিদেশের দেশ। বিচিত্র তাদের বেশ।

ঊর্ধ্বে মহাম্বরে সঞ্চরমান খেচর, জলধর।

অরবিন্দকে বহন ক'রে অর্ণবযান আগমন করল ভারতের বোম্বাইয়ের এপোলো বন্দরে। পবন প্রবাহিত হচ্ছে তখন মন্দ মন্থরে। বিহঙ্গকুল কূজন করে।

সেই কূজন যেন অরবিন্দকে আহ্বান ক'রে বলে, হে সুজন, শুভ সঞ্চারী হোক তব আগমন!

অরবিন্দ স্পর্শ হর্ষ প্রাপ্ত হলেন ভারতের মৃত্তিকার- ভারতের মৃৎটিকার!

তিনি তখন যাত্রা করলেন পিতৃচরণরেণু মস্তকে ধারণ কামনায়।

সেই হেতুই ঐ অব্দ ভারতের পক্ষে আনন্দ-অব্দ।

আদি কবি মহাকবি বাল্মীকি-বিরচিত রামায়ণ মহাকাব্যে উক্ত হয়েছে,—রাম বনবাসে অবস্থান করেছিলেন চতুর্দশ বর্ষ।

অরবিন্দও বিলাত-বাসে যাপন করেছিলেন চতুর্দশ বর্ষ।

পিতৃ-প্রসাদ-অপ্রাপ্তি-বিষাদ

এদিকে অরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ছিলেন অরবিন্দ দর্শনের সাগ্রহ প্রতীক্ষায়।

তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রকে আনয়ন করার জন্য বোম্বাই গমন করেছিলেন। সেই স্থানে বেশ কিছু দিন অপেক্ষাও করেছিলেন। কিন্তু অরবিন্দ কোন্ দিন আগমন করবেন, কোন্ অর্ণবযানে আগমন করবেন, তখনকার দিনে সে সংবাদ তিনি তেমন কিছুই অবগত হতে সমর্থ হলেন না। অগত্যা তিনি তাঁর কর্মস্থল খুলনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

অপেক্ষা করতে লাগলেন অরবিন্দ সম্বন্ধীয় বার্তার জন্য।

শেষ পর্যন্ত, একটা বার্তা একদিন এল একটা টেলিগ্রাম। ইংলণ্ড হতে ভারতযাত্রী জাহাজ সাগরগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে গেছে, সেই তারবার্তায় ছিল এই সংবাদ।

পুত্র সন্দর্শন-কামী পিতার মনে হল, সমুদ্র অর্ণবযানকে গ্রাস করেছে, তাঁর অরবিন্দকেও গ্রাস করেছে।

প্রকৃত পক্ষে, অরবিন্দ সেই সাগরগ্রাস-গ্রস্ত অর্ণবযানের আরোহী ছিলেন না।

কৃষ্ণধন মিথ্যা পুত্রশোকে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সেই মূর্ছা আর ভঙ্গ হ'ল না। ইহলোকের সুখ-দুঃখের সীমানা অতিক্রম ক'রে, তিনি চলে গেলেন অজানা জগতে।

অযোধ্যা হতে দূরগত দাশরথি রাম যখন লঙ্কা জয়ের পরে

প্রত্যাবর্তন করলেন অযোধ্যায়, তাঁর পিতা রাজা দশরথ তার পূর্বেই পরলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অরবিন্দ এবং তাঁর পিতা কৃষ্ণধনের ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটনা ঘটল।

অরবিন্দ তাঁর পিতার প্রসাদ প্রাপ্তির পরমানন্দ প্রাপ্ত হ'তে পরলেন না। তাঁর সাধ বিষাদে পরিণত হল।

বরোদায় বরেণ্য অরবিন্দ

বিদ্বান অরবিন্দ বরোদায় গমন করলেন।

আরম্ভ হ'ল অরবিন্দোপম অরবিন্দের জীবনের আর এক অঙ্ক।

বরোদারাজ বেশ বুঝে নিয়েছিলেন, অরবিন্দকর্মী পুরুষ মর্মী পুরুষ, ধর্মী পুরুষ।

অরবিন্দ যাতে রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের কার্যে কুশল হয়ে ওঠেন, সেই ছিল বরোদারাজের অভিলাষ।

তাই অরবিন্দকে রাজ্যকার্যের বিভিন্ন বিভাগে কর্মভার প্রদান করা হতে লাগল।

প্রথমে অরবিন্দকে বরোদারাজ্যের সেটেলমেণ্ট বিভাগের কার্য প্রদান করা হল।

রাজস্ব বিভাগের কার্যে নিযুক্ত করা হল তার পর।

পরে কর্মপ্রদান করা হল রাজ্যের সরকারী দপ্তরখানায়।

প্রত্যেকটি কার্যেই অর্থজনোচিত যোগ্যতা প্রদর্শন করলেন অরবিন্দ।

শিক্ষামৃত বিতরণে

কিন্তু অরবিন্দ যে জগতে বিকশিত হয়েছেন মানুষের শিক্ষক হওয়ার জন্য; মানুষকে আলোকে আপ্লুত করার জন্য।

অরবিন্দ অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন, তাঁকে কলেজের কার্যে নিযুক্ত করা হলে, ভালো হয়।

কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারলেন, তা হ'লে কলেজে আলো হয়!

তাঁর অনুরোধ সমাদৃত হ'ল। প্রথমে তিনি হলেন ফরাসী ভাষার শিক্ষক।

ফ্রান্সের ভাষা অতি খাসা। সেই ভাষা তৃপ্ত করে রসিক জনের রসপিপাসা। ফরাসী ভাষাব গল্প ও উপন্যাস যেন পারিজাত-নির্যাস!

অতঃপর, অরবিন্দ হলেন ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। শিক্ষার্থীদের মনে লাগল, অরবিন্দের অধ্যাপনা যেন জ্যোছনা। শিক্ষার্থীরা অনুভব করতে লাগল এক বিপুল সাহিত্যরস-উন্মাদনা।

যুবক অধ্যাপক অরবিন্দ অধ্যাপকরূপে তাঁর এরূপ রূপ প্রদর্শন করলেন, যে কলেজের উপাধ্যক্ষের-পদে তাঁকে আহ্বান জানাল।

অরবিন্দ হলেন কলেজের উপাধ্যক্ষ।

অতঃপর, ছাত্ররা চাইল, কর্তৃপক্ষ চাইলেন, অরবিন্দ ঐ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হলে, মহাবিদ্যালয় একটি মহান প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে।

বিদ্যাদক্ষ অসমকক্ষ অরবিন্দ হলেন ঐ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

অরবিন্দ-স্পর্শে মহাবিদ্যালয় আপ্লুত হ'ল হর্ষে।

দরোদার মহারাজা অরবিন্দের প্রতি কিরূপ দৃষ্টি দান করতেন?

প্রীতি-পরিপ্লুত মিষ্টি দৃষ্টি।

জনগণ অরবিন্দকে কিরূপ মনে করতেন?

অরবিন্দ তাঁদের আপন জন, এইরূপ মনে করতেন জনগণ।

বিদ্যাশ্রদ্ধ ও বিদ্যাব্রহ্ম

বিদ্যাবদান্য অরবিন্দের নিকট হতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যাবিত্ত লাভ করতে লাগল।

এই বিশ্বের বিদ্যার মর্যদা কিরূপ?

বিদ্যার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে প্রাচীন ভারত-ভারতী এইরূপ ঃ

নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুঃ

—বিদ্যার সমান চক্ষু নাই।—চক্ষু না থাকলে, মানুষের জীবন বৃথা। বিদ্যা না থাকলেও মানুষের জীবন জঙ্গলবৎ।

বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পুজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পুজ্যতে।

—বিদ্যাবত্তা এবং রাজত্ব, এই দুইটি কদাপি সমান নয়। রাজা নিজের দেশে পূজিত বা মর্যাদাপ্রাপ্ত হন। কিন্তু যিনি বিদ্বান, তিনি সকল দেশেই সম্মান প্রাপ্ত হন।

বিদ্যা সর্বস্য ভূষণম্।

—বিদ্যা সকলেরই অলংকার স্বরূপ হয়ে থাকে। বিদ্যাবিভূষিত নর সকলেরই মনোহর।

কিন্তু যে ব্যক্তি বিদ্যাবিহীন, তার অবস্থা কিরূপ ?

রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ॥

—কোন লোক হয়তো রূপযৌবনযুত হতে পারে; উচ্চকুলোদ্ভব হতে পারে। কিন্তু তার যদি বিদ্যা না থাকে; তা হলে, সে শোভা পায় না। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সৌরভ সম্পন্ন পুষ্পহীন কিংশুক বা পলাশ পুষ্প বৃক্ষ।

বিদ্যাধন মহাধন! বিদ্যারত্ন।

জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে।
দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্॥

—বিদ্যারত্ন মহাধন। এইধন জ্ঞাতিগণ ভাগ ক'রে নিতে পারে না; এই ধন চোরেও চুরি ক'রে নিয়ে যেতে পারে না; এইধন দান করলেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

প্রতিদিন মহাবিদ্যালয়ের কর্ণধারের কর্ম সম্পাদনের পূর্বে ও পরে অরবিন্দ কিসের মধ্যে অবস্থান করতেন ?

অবস্থান করতেন বিদ্যাম্ভোধিমধ্যে।

তাঁর সম্মুখে-পশ্চাতে, দক্ষিণে-বামে গ্রন্থ থাকত রাশি রাশি, নানা ভাষাভাষী। যেন ভারতীর অমৃতহাসি।

অরবিন্দ সেই সব করতেন পাঠ। সেই সবের মধ্যেই তরুণ অরবিন্দের চিত্ত করত পাট ; তিনি প্রাপ্ত হতেন যেন রাজপাট।

ধর্মশাস্ত্র, যা হচ্ছে মানুষের জীবনযুদ্ধের যথার্থ অস্ত্র-শাস্ত্র, তাই নিয়ে তাঁর মন থাকত ব্যস্ত।

দর্শন বিজ্ঞান করত তাঁর মধ্যে বলাধান।

গল্প, কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস তাঁর পক্ষে ছিল যেন সরস্বতীর সরোজনির্যাস !

ভারতের ভাষা সংস্কৃত অমৃত অরবিন্দ আস্বাদন করতে লাগলেন অপরিমেয় আগ্রহে। সংস্কৃত শিক্ষায়, তিনি নিজেই হলেন নিজের শিক্ষক।

শিক্ষা করলেন ভারতের ভাষা গুজরাটী ও মারাঠী। শিক্ষা করলেন হিন্দুস্থানের ভাষা হিন্দি। ভারতের নানা ভাষার সারিতে সারিতে দিবসে ও রজনীতে হতে লাগল অরবিন্দের অমৃত স্নান।

স্মরণশক্তিকে বলা যায় জীবনের একটা রণশক্তি। অরবিন্দের স্মরণশক্তি ছিল প্রবল। তাই সহজ হয়েছিল তাঁর পক্ষে বিদ্যাবর্ত্মে চলা।

ভারতের ভাতির যুগের ইতিহাস ত্যাগ, তপস্যা, সংযম, শৌর্য, সৃষ্টির ইতিহাস। ভারতের বেদ, বেদান্ত, সাহিত্য, পুরাণ, শিক্ষা, সাম্য শান্তির নিদান ও নিধান। অরবিন্দ সেই সবের মধ্যে রইলেন মগ্ন। তাঁর জীবনকে ক'রে তুলতে লাগলেন অমৃত-মাহেন্দ্র-লগ্ন।

সংস্কৃত ভাষায় ভাষিত ভারতের বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ সুচির আনন্দ সম্পদ; গীতা-মনুসংহিতা সর্বমানবের মিতা: মহাভারত, রামায়ণ চিরন্তন অমৃত প্রস্রবণ। অরবিন্দ সেই সকলের মধ্যে যেন সমাধিমগ্ন হয়ে থাকতে লাগলেন।

রামায়ণ-মহাভারতের কোন কোন তরঙ্গ, কোন কোন উল্লাস তিনি মহোল্লাসে ইংলণ্ডীয় ভাষায় রূপান্তরিত ক'রেছিলেন।

বঙ্গ ভাষার সঙ্গ

অরবিন্দ তো অনেক ভাষার ভাসে ভাসশীল ভানুবৎ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁর মাতৃভাষা যে বঙ্গভাষা, সেই ভাষাটি সম্বন্ধে তিনি তখন কি অবস্থায় রয়েছেন? কি করছেন?

তিনি তখন বঙ্গভাষাকে আপন ক'রে তুলবার পণ করেছেন।

বাংলা বলছেন, বাংলা পড়ছেন, বাংলা লিখছেন।

অরবিন্দ তখন তাঁর বঙ্গভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে লক্ষ্য ক'রে বুঝতে পারলেন, তাঁকে বাংলা শিক্ষা দানের জন্য এক জন শিক্ষক তাঁর প্রয়োজন।

তিনি তখন তাঁর আত্মীয়দের নিকট পত্র প্রেরণ করলেন ঐ বিষয় সম্বন্ধে।

তখনকার দিনে দীনেন্দ্রকুমার রায় ছিলেন সুবিজ্ঞ বাংলা সাহিত্যিক। তিনি ছিলেন বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত।

অরবিন্দের আত্মীয়রা দীনেন্দ্রকুমারকে প্রেরণ করলেন নবীন অরবিন্দকে বঙ্গভাষায় প্রবীণ করে তুলবার জন্য।

দীনেন্দ্রকুমারের বিদ্যাদানগুণে অরবিন্দ বঙ্গভাষাজ্ঞানে বিকশিত হয়ে উঠতে লাগলেন।

বঙ্গভাষা-বিটপীর অনেক ফুল, অনেক ফল সুসমৃদ্ধ সুশোভিত করতে লাগল অরবিন্দের চিত্তস্থল।

মহাকবি মাইকেল মধুর বিরচিত সাহিত্য মধুচক্রের মকরন্দে অরবিন্দ বিভোর হলেন মহানন্দে।

প্রকৃত মানুষ সৃষ্টির সাহিত্যস্রষ্টা, সত্যদ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অরবিন্দের পক্ষে হ'ল অমৃত উচ্ছ্বাস।

অরবিন্দ দেখলেন, বঙ্কিম-বিরচিত "আনন্দমঠ" ভারতের আনন্দমঠ, বিশ্বের আনন্দমঠ।

আনন্দমঠ-এর ভাষা অতিশয় খাসা, ভাব শক্তি ও মুক্তির দিব্য প্রবাহ। আনন্দমঠ মানুষকে কেবল মাত্র সুসাহিত্য-রস দান করে না, শৌর্যরসও দান করে।

আনন্দমঠে অরবিন্দ প্রাপ্ত হল তাই, সেই সময়ের পরাধীন ভারতের পক্ষে যেমনটি চাই, আর বর্তমান স্বাধীন ভারতের পক্ষে যেমনটি চাই।

আনন্দমঠ অরবিন্দকে আনন্দান্দোলিত করায়।

বঙ্কিমের বিরচিত "বন্দেমাতরম্" অরবিন্দের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করল সেই তত্ব, যে তত্ব চরম ও পরম।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের বাণী, স্বামী বিবেকানন্দের রচনা অরবিন্দের সম্মুখে ধ্বনিত করল এক দেব-দেশের দেশনা।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গভাষাকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।

অরবিন্দ সেই রতন আহরণে সযতনে রত রইলেন।

প্রতি দিনকার আহার-বিহার

বিদ্যা-বারিধি মন্থন-মগ্ন অরবিন্দ ঐ সময়ে কিরূপে কাল কর্তন করতেন ?

অরবিন্দ তখন জীবন যাপন করতেন তাঁর কোটি কোটি ভারতীয়

ভাইয়ের মতো। আহার করতেন ডাল-ভাত-রুটি-তরকারি, আর যৎকিঞ্চিৎ দুগ্ধ। আহারে মিতাচারই ছিল তাঁর সুস্বাদু আচার।

শয়ন করতেন লৌহময় এক খট্টায়। শৈত্য-দৈত্যের অক্রমকালেও লেপের সাহায্য কে না চায়? এই ছিল ভাবটি।

পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ-বাস ছিল কি প্রকার?

শুঁড়যুতা নাগরা জুতা তাঁর চরণ বরণ করত। পরিধানে আহমদাবাদের কলকৃত স্থূল অংশুক প্রদান করতে চাইত তাঁকে সুখ। গায়ে মেরজাই, তার যেন আর তুলনা নাই! কচ্ছ অর্ধবিলম্বিত, যেন উপেক্ষিত। বাবরিকাটা কেশকলাপাকুল শিরোদেশ। তার মধ্যদেশে সিঁথি, যেন কেশকুঞ্জে দীধিতি! দেহ পীন নহে, ক্ষীণ। বদনে দুরন্ত বসন্তের প্রাণান্ত-প্রচেষ্টার কিঞ্চিৎ চিহ্ন। বপুর্বর্ণ শ্যাম, অতি অভিরাম। প্রেক্ষণে পরমতার প্রকাশ। আস্যের হাস্য যেন বিশ্বরূপের ভাষ্য!

বিদ্যাবারিধিমন্থনে, আহার-বিহার-বেশবাস সংযমে, স্বদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পন্থাচিন্তনে, অরবিন্দ হয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন।

অন্তরে-বাহিরে সন্তরে ভারত ভাব

অরবিন্দের অন্তরে তখন সন্তরে ভারত-ভাব; অরবিন্দের বাহিরে তখন ভারত-ভাব। সেই ভারত-ভাবকেই তিনি মনে করতে লাগলেন তাঁর জীবনের পরম লাভ।

ভারতের ভাল ছেলে অরবিন্দ লক্ষ্য করলেন, ভারতের ভাণ্ডার অফুরন্ত-ভাস্বরতার আগার।

ভাল ভারতের মানব-মানবী, ভাল ভারতের গিরিদরি-অটবী, ভাল ভারতের কাব্য-পুরাণ-শাস্ত্র-সংস্কার, ভাল ভারতের জীবনযাত্রা

প্রতিদিনকার, এই চিন্তা চিন্ময় করতে তুলতে লাগল অরবিন্দের চিত্তদেশে।

অরবিন্দ, এমন কি, ভূতের অস্তিত্বেও অবিশ্বাস করতেন না।

একদিন একজনে বললেন অরবিন্দকে, আপনি জ্ঞানী হয়েছেন, তবু ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করছেন?

অরবিন্দের অরবিন্দ বদনে অরবিন্দহাসি বিকশিত হল।

প্রশ্নকর্তা শ্রবণ করলেন অরবিন্দের অভিমত: বিধাতার এই মহাবিশ্বে বিস্ময়কর কত কিছুইতো রয়েছে!—ভূত কেন থাকতে পারবে না?—ভূতে বিশ্বাস এমন কি আর অদ্ভুত!

জ্যোতিষের প্রতিও অরবিন্দের অপ্রীতি দেখা গেল না। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে মানুষ পতিত হতে পারে সুখের ভাবে, দুঃখের ভাবে, এটাও অরবিন্দের মত মেনে নিতে অসম্মত হল না।

দিবধামে বা দিব্যধামে বা ত্রিদিবে দেব-দেবী বিদ্যমান, এ প্রত্যয়ও অরবিন্দের হৃদিদেশে রইল না অবিদ্যমান।

ঐ সম্বন্ধে পূর্বে তাঁর প্রত্যয় না থাকলেও পরে একাধিক ঘটনায় তাঁর প্রত্যয় উৎপন্ন হয়।

একদা অরবিন্দ অশ্বশকটারোহী হয়ে একস্থানে গমন করছিলেন। হঠাৎ ঘ'টে গেল এক দুর্ঘটনা। গাড়ী উলটে প'ড়ে গেল। একটা খাদের মধ্যে পতিত হল, অরবিন্দও পতিত হলেন। শকট চূর্ণ হল, বিচূর্ণ হল, কিন্তু আরোহী অরবিন্দ কি হলেন? চূর্ণও হলেন না, বিচূর্ণও হলেন না; পূর্ণ ই রইলেন।

সেই পতন অবস্থায়, তিনি তখন অনুভব করেছিলেন, এক দেবতার পাণি তাঁকে ধারণ করে তাঁর জীবনহানি হতে দিল না।

অন্য এক দিবসে।

নর্মদা নদীর তীরে দেবী কালীর মন্দিরে প্রবেশ করলেন অরবিন্দ। তখন সেই দেবীমূর্তি দর্শনে, তাঁর বোধ হল, সেই পাষাণ যেন

হয়ে উঠেছে প্রাণবান, হয়ে উঠেছে জ্যোতিষ্মান, হয়ে উঠেছে কল্যাণ-নিধান।

জ্বালো-জ্বালো নূতন আলো

অরবিন্দের বরোদায় বসবাস-কালে, তাঁর মধ্যে যে কেবলমাত্র ভারত-ভাবেরই উদ্ভব হতে লাগল, তাই নয়; ভারতের সেবার ভাবও তাঁকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলল।

তখনকার কংগ্রেসের নরমপন্থী-নীতি ভারতে স্বাধীনতার দীধিতি সঞ্চারে সমর্থ হতে পারে না, তাঁর ধারণা এইরূপ প্রাপ্ত হল।

অরবিন্দ লেখনী ধারণ করলেন। রণে অবতীর্ণ হলেন—রচনা-রণ।

মহারাষ্ট্রিয় যুবক কেশব রাও দেশপাণ্ডে কেম্ব্রিজে ছিলেন অরবিন্দের সতীর্থ। তিনি যথাসময়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন। তারপর, 'ইন্দুপ্রকাশ" পত্রিকা প্রকাশ করলেন। অরবিন্দকে বললেন তিনি, তুমি ধারণ কর লেখনী। চালাও রচনা-রণ, ভারতের স্বাধীনতা উদ্ধারে।

অরবিন্দ "ইন্দুপ্রকাশ" পত্রিকায় "New Lamps for old" শীর্ষক কতকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশ করতে লাগলেন। এই সুভাষিতের অর্থ হল: পুরানো প্রদীপ কর বর্জন, নূতন প্রদীপ কর প্রজ্বলিত। ঐ প্রবন্ধ হ'ল নরমপন্থীদের গরমপন্থী করে তুলবার।—জ্বালো জ্বালো জ্বালো নূতন আলো। ভারত হতে পরলোকে প্রেরণ করো পরাধীনতার কালো!—এইভাব ঘোষণা করতে লাগলেন অরবিন্দ ঘোষ। পরাধীনতা প্রণাশ-প্রহরণ সেই প্রবন্ধ অরবিন্দ নিজ নামে প্রকাশ করলেন না, প্রকাশ করলেন ছদ্মনামে।—প্রশংসাপ্রাপ্তি প্রবণতা তাঁকে কখনও পেয়ে বসেনি।

সেই সকল প্রবন্ধে অরবিন্দের ভারতের অরিন্দম-ভাব, ইন্দ্রভাব প্রকটিত হ'তে লাগল।

বিদেশী-শাসক আমাদের প্রধান নাশক নয়। আমাদের নাশক আমাদের ভীরুতা ও দুর্বলতা।

হৃদয়ের দুর্বলতা মানুষকে দুর্বলতার মতো ক'রে ফেলে। আমাদের দেশের কংগ্রেসে দেশের জনগণকে চাই। ইংরাজীতে শিক্ষিত ও দীক্ষিত হয়ে যারা বরণ করেছে ইংরাজ-রাজের বশ্যতা, তাদের দ্বারা কি প্রকারে পরাধীনতার প্রাকার পার হয়ে আবির্ভূত হ'তে পারে ভারতের স্বাধীনতা!—ভাবের এইরূপ রূপ প্রকাশিত হ'তে লাগল অরবিন্দ-রচনায়।

ঐরূপ প্রবন্ধ কয়েকবার প্রকাশিত হল। মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অমনি নরমপন্থীদের যেন হল লোমহর্ষণ। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রাণাডে। তিনি স্বয়ং সত্বর গিয়ে উপস্থিত হলেন "ইন্দুপ্রকাশ" পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর ভবনে। অস্থিরভাবে বললেন, আমরা ছিলাম সুস্থির। কিন্তু ঐ প্রবন্ধগুলো আমাদের করে তুলছে অস্থির—আমাদের অস্থির মধ্যে সঞ্চার করছে ত্রাস। আমরা দেখছি সর্বনাশ সমুপস্থিত। ঐ প্রবন্ধ অবিলম্বে বন্ধ কর।

অরবিন্দের লেখনি-খনি হতে অনুরূপ রচনা-রত্নও রূপপ্রাপ্ত হয়েছিল "ইন্দুপ্রকাশ" পত্রিকায়।

বঙ্গ-সাহিত্যের দুই শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ হচ্ছেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং অসম-সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মাইকেল সম্বন্ধে বলা যায়, স্বীয় রচনা-রত্নরাজি নিয়ে বঙ্গ-সাহিত্যে এলেন মহাকবি মাইকেল, যেন মাইক এল—উচ্চধ্বনি উৎসারী মাইক বা মাইক্রফোন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বলা যায়, যেখানে ছিল পুকুর, বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে সৃষ্টি করলেন পারাবার—রত্নাধার।

অরবিন্দ, মাইকেল মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-রত্ন সম্বন্ধে যত্ন

সহকারে অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ "ইন্দুপ্রকাশে" প্রকাশিত হল। বঙ্কিমের বিরচিত "বন্দেমাতরম্"-এর মধ্যে অরবিন্দ কিরূপ প্রেরণা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর "ভবানীমন্দির" শীর্ষক প্রচার-পুস্তিকায় তার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্বদেশ-সেবা সাধনায়

অরবিন্দ দেখলেন, কেবলমাত্র লেখনী-চালনা দ্বারাই স্বাধীনতা-সম্পদ প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত হতে পারে না; অসির সহায়তা চাই। সাহস ও ওজস্ সম্প্রাপ্ত হয় স্বাধীনতার স্বর্ণ-তৈজস। বিপ্লব-প্লব বা বিপ্লব-ভেলা পরাধীনতার পরপারে স্বাধীনতার স্বর্ণ-সৈকতে নিয়ে যায়।

অরবিন্দ অরুণোপম তরুণদের নিয়ে সংগঠিত করলেন "তরুণসঙ্ঘ"। তিনি তাদের সম্মুখে স্বাধীনতা সম্বন্ধে ভাষণ দান ক'রে তাদের বুকে অনুপ্রবিষ্ট করাতে চেষ্টা করতে লাগলেন সেই ভাব, যার বলে স্বাধীনতা হতে পারে লাভ। তিনি বোঝাতে লাগলেন, যাজ্ঞাদ্বারা স্বাধীনতা-সম্পদ লাভ হয় না। যাচনে সম্মান নষ্ট হয়। কষ্ট ক'রে স্বাধীনতা সমুপার্জন করতে হবে। আমাদের চাই শারীরিক বল; চাই নৈতিক বল; চাই আধ্যাত্মিক বল। তা হলেই পরাধীনতার অচল চ'লে যেতে পারে।

মহারাষ্ট্রের লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিলেন বিপ্লবের অমল-পুলক। উদয়পুরের পুরুষপুঙ্গব ঠাকুর সাহেব বিপ্লবী দল সৃষ্টি করেছিলেন পুণায়। সৈন্যদের মধ্যে সৃষ্টি করছিলেন বিপ্লব-বন্যা, যার ফলে ভারতভূমি হতে পারে ধন্যা। অরবিন্দের প্রচেষ্টা হতে লাগল সেই প্রকার।

দেশের কাজে, দশের কাজে জীবন যেন যজ্ঞ হয়ে রাজে,—অরবিন্দের এই ভাববৈভব বিকীর্ণ হতে লাগল ছাত্রদের মধ্যে।

শক্তিপথে

ভারতে শক্তির উদ্‌বোধন করতে হলে ভবানীশক্তির সাধনা চাই, ভবানীশক্তির ভাবে বিভোর হওয়া চাই। এই ভাবের বসে, অরবিন্দ "ভবানীমন্দির" প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্ট হলেন। এই প্রেরণা প্রচারকল্পে, বিরচিত হল একখানি পুস্তিকা। তার নাম হল "ভবানীমন্দির"।

ইতিমধ্যে অরবিন্দ অনুজ বারীন্দ্রকুমার বরোদায় এসেছেন। "ভবানীমন্দির" প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টায় তিনিই হলেন অগ্রবর্তী কর্মী।

ভবানীমন্দির এই ভবের জননী ভবানীর মন্দির। মন্দির কোথায় প্রতিষ্ঠা করা হবে?

সুদুর্গম পার্বত্য প্রদেশে। সেই স্থানে ভারতের স্বাধীনতা-সাধক সন্তানেরা করবে শক্তি-চর্চা—মুক্তি চর্চা।

গঙ্গামঠ

সত্যদ্রষ্টা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় মূর্ত হয়েছে আনন্দমঠ। "ভবানীমন্দির" পথের পথিকেরা নর্মদা নদীর তীরে প্রাপ্ত হলেন একটি মঠ।

তার নাম "গঙ্গামঠ"। স্থান নিভৃত, নির্জন। স্বাধীনতা লাভের শক্তি অর্জন করতে সেইস্থানে প্রতিষ্ঠিত হল ভবানীমন্দির।

"ভারতীবিদ্যালয়"। সে যেন স্বাধীনতার আরতি বিদ্যালয়।

ছাত্রদের দেহ-দুর্গকে দুর্ধর্ষ ক'রে তুলবার জন্যে, একজন হাবিলদার তাদের ব্যায়াম এবং সেই সঙ্গে আধুনিক সংগ্রাম শিক্ষা প্রদান করতে

লাগলেন। ভট্ট বা সুপণ্ডিত রামভট্ট ছাত্রদের বিদ্যাদান করতে লাগলেন।

আধ্যাত্মিক আনন্দের ভাণ্ডারী কেশবানন্দ ছাত্রদের প্রদান করতে লাগলেন আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

লাঠি রক্ষা করে মাটি।

যারা ধারণ করতে পারে না লাঠি, তাদের জীবন দুর্বলতায় হয়ে যায় মাটি। সেই লাঠি ঘূর্ণনের শিক্ষা দান করা হতে লাগল।

দেশভক্ত ছাত্ররা দুই দলে বিভক্ত হত। একদল আর একদলকে আক্রমণ করত। কিন্তু আহত হলেও কেউ আর্তনাদ করবে না, পশ্চাতে হটবে না, ছুটবে না। এই ছিল সেই ভারত বৈরীধি তাড়নে বদ্ধপরিকর বীরব্রতীদের আদর্শ।

কিন্তু সংঘ পরিচালনে অর্থও চাই।

কে যোগাত তা?

যোগাতেন অরবিন্দ স্বয়ং। আর যোগাতেন তার কয়েকজন অকৃত্রিম বন্ধু।

স্বার্থের জন্যে যে অর্থ, সে অর্থ মানুষের মনকে ক'রে আর্ত।

পরার্থের জন্যে যে অর্থ, সে অর্থ মানুষের মনকে ক'রে তোলে সমর্থ। এরই দৃশ্য দৃষ্ট হতে লাগল তাঁদের সেই অবদানের মধ্যে।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কর্মীর কর্মশক্তি যদি তাঁর অন্তরের ব্রহ্মশক্তিদ্বারা পরিচালিত হয়, তা হলে, অস্ত্র-বলের বাণী বিদেশী শাসকের নাশকশক্তিকে নস্যাৎ করে দেওয়া সম্ভব হতে পারে, অরবিন্দের হৃদয় মাঝারে এইরূপ বোধ জাগ্রত হল।

যোগাভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মশক্তি লব্ধ হতে পারে। এই ধারণা সুপ্রচলিত। অরবিন্দ যোগাভ্যাসে ইচ্ছুক হলেন।

কিন্তু যোগাভ্যাস কর্মটি সহজসাধ্য নয়। যোগাভ্যাসের জন্য প্রকৃত যোগীর নিকট শিক্ষাগ্রহণ প্রয়োজন হয়।

তাই অরবিন্দ সন্ধান করতে লাগলেন একজন যথার্থ যোগীজনের।

তরঙ্গমর্মময়ী নর্মদার সৈকতে অবস্থিত ছিল অনেক যোগীজনের যোগাশ্রম। অরবিন্দ সেই সব আশ্রমে গমন করতে লাগলেন। যুবক অরবিন্দের যোগাভ্যাসের আগ্রহ দর্শনে, কোন কোন যোগী পুরুষ খুবই খুশী হলেন।

অরবিন্দ তাঁদের নিকট হতে অবগত হলেন, প্রাণায়াম করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। ধ্যান করাই উত্তম উপায়।

অরবিন্দ প্রাণায়াম করা আরম্ভ করলেন।

প্রাণায়াম কাকে বলে?

নিজের নিঃশ্বাস আকর্ষণ করে নিয়ে, বেশ কিছুকাল পর্যন্ত সেই নিঃশ্বাস ত্যাগ না করা, তার পর ধীরে ধীরে সেই নিঃশ্বাস ত্যাগ করা, এই প্রক্রিয়াকেই বলে প্রাণায়াম।

অরবিন্দ রোজ কয়েক ঘণ্টা কাল যাবৎ প্রাণায়াম ক্রিয়া করতে লাগলেন।

প্রাণায়াম প্রসাদে, অরবিন্দের মস্তিষ্কের এবং স্বাস্থ্যের কিঞ্চিত উন্নতি লব্ধ হল।

অরবিন্দ ধ্যানও করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ যাবৎ একটি বিষয় সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তাকেই বলা যায় ধ্যান।

অরবিন্দের ঐরূপ যোগাভ্যাস এবং ধ্যান কর্মের ফলে, তাঁর শারীরিক এবং মানসিক উৎকর্ষ কিঞ্চিৎ আয়ত্ত হল। কিন্তু বিশ্ব-বিধাতার শক্তির সঙ্গে স্বীয়শক্তি সম্মিলিত হওয়ার ব্যাপারটা রইল তখনও বহু দূর।

লক্ষ্য করা যায়, অরবিন্দ তাঁর জীবনের ঐ যুগে অধ্যাপকের কর্ম করছেন, বিপ্লবীদল সংগঠন করছেন, আর যোগাভ্যাস করেছেন।

একাধিক কর্মরূপ ধর্ম, তাঁকে ধর্মপথে বা সুখের পথে—তুচ্ছ সুখের পথে—প্রচলিত করছে।

"পদ্ম ও পদ্ম"

প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ভাষায় উক্ত হয়েছে: সস্ত্রীক ধর্ম-আচরণ করা উচিত। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে ধর্মাচরণ করবে।

অরবিন্দ দারপরিগ্রহ করেছিলেন।

অরবিন্দের সহধর্মিনীর নাম মৃণালিনী। মৃণালিনী শব্দটির অর্থ—পদ্ম। অরবিন্দ শব্দটির অর্থ— পদ্ম।

দেখা যাচ্ছে, অরবিন্দের নামের অর্থ এবং তাঁর পত্নীর নামের অর্থ ঠিক একই। এ এক চমৎকার সাদৃশ্য!—সকলের পক্ষে এ যেন এক সুখ দৃশ্য!

রসিক জনেরা তখন হয় তো বলতেন, পদ্মে পদ্মে পরিণত! সেটা হচ্ছে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে।

অরবিন্দের বয়ক্রম তখন ঊনত্রিশ বৎসর। ঐ সালে, ঐ বয়সে অরবিন্দের উদ্বাহ বা বিবাহ সুসম্পন্ন হয়।

বিবাদ হয়েছিল হিন্দুশাস্ত্র এবং হিন্দুর সামাজিক প্রথা অনুসারে।

অরবিন্দ ইংলণ্ডে গমন করেছেন—কালাপানি পার হয়েছেন—অহিন্দুদেশে বসবাস করেছেন। তাই তখনকার হিন্দু সমাজ বলে উঠল, অরবিন্দের জাত্ গিয়েছে। তিনি এখন আর হিন্দু নন। অরবিন্দকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তবেই তিনি আবার হিন্দু পদবাচ্য হবেন।

কিন্তু অরবিন্দের অভিমত প্রকাশ পেল: নির্মল যার চিত্ত, তার কি প্রয়োজন হয় প্রায়শ্চিত্ত!

কালাপানি পার হলে, মানুষের মন কালো হয়ে যায় না—মলিন হয়ে যায় না—এ খাঁটি ভাবটি অবলম্বন করলেন অরবিন্দ।

অরবিন্দের সহধর্মিণী মৃণালিনী ছিলেন শারীরিক সুষমাশালিনী; মানসিক সুষমাশালিনী। তিনি ছিলেন বিদ্যাবতী।

মৃণালিনীর পিতার নাম ভূপালচন্দ্র বসু। তিনি বিহারের অন্তর্গত রাঁচির অধিবাসী ছিলেন। পদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন।

অরবিন্দ তাঁর সহধর্মিনী মৃণালিনীর নিকট বিভিন্ন সময়ে পত্র প্রেরণ করেছেন।

সেই সব পত্র যেন মহাভাবের সূত্র। সেই সব পত্রে ছত্রে ছত্রে দিব্যভাব, জাতীয়তার ভাব, সাধনার ভাব, সংযমের ভাব, ত্যাগের ভাব, এবং আরও কত কত মহৎ ভাব ভাস্বর হয়ে বিরাজ করছে।

অরবিন্দ তাঁর পত্রে তাঁর পত্নী মৃণালিনীকে লিখেছেন:

"....এখন কথাটা এই, তুমি হিন্দু ধর্মের পথ ধরিবে, না নূতন সভ্য ধর্মের পথ ধরিবে? পাগলকে বিবাহ করিয়াছ সে তোমার পূর্ব-জন্মার্জিত কর্মদোষের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল। সে কি রকম বন্দোবস্ত হইবে?...... তুমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্বপুরুষের রক্ত তোমার শরীরে, আমার সন্দেহ নাই তুমি হিন্দুধর্মের পথই ধরিবে।

"আমার তিনটি পাগলামী আছে। প্রথম পাগলামী এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন সবই ভগবানের। যাহা পরিবারের ভরণপোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত।........

"দ্বিতীয় পাগলামী সম্প্রতিই ঘাড়ে চেপেছে। পাগলামীটা এই, যে কোন মতে ভগবানের দর্শন লাভ করিতে হইবে।....ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি।........

"তৃতীয় পাগলামী এই যে, স্বদেশকে অন্য লোকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ-ক্ষেত্র-বন-পর্বত-নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে 'মা' বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে—ব্রহ্মতেজও আছে সে তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত ভগবান এই মহাব্রতসাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।......

"এখন বলি এ বিষয়ে তুমি কি করিতে চাও? স্ত্রী স্বামীর শক্তি, তুমি........সাহেব পূজা মন্ত্র জপ করিবে? উদাসীন হই

স্বামীর শক্তি খর্ব করিবে? না সহানুভূতি ও উৎসাহ দ্বিগুণিত করিবে?......

স্বীয় উদ্বাহ উপলক্ষে অরবিন্দ বরোদা হতে কলিকাতায় আগমন করেন। তখন তিনি বঙ্গের নানাস্থানে সঞ্চরণ ক'রে রাজনৈতিক অবস্থা লক্ষ্য করেন।

তিনি লক্ষ্য করেন যে তখনকার এখানকার রাজনৈতিক অবস্থা স্বাধীনতা লক্ষ্যের দিকে তেমন নেই। জড়তা সকলকে জড়িয়ে রয়েছে। জাগরণ-রণ দেখা যাচ্ছে না।

অরবিন্দ বঙ্গের অনেকের নিকট বিপ্লববাদবার্তা প্রচার করলেন। স্বাধীনতা আয়ত্ত করবার জন্য গেরিলা যুদ্ধের উপযোগিতার কথা বললেন। কিন্তু তাঁর মতানুবর্তী হলেন মাত্র অল্প কয়েকজন।

কলিকাতার জোড়া-সাঁকোয় ঠাকুর কুলের সরলা দেবী, মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্র বসু এবং ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র প্রভৃতি অরবিন্দের অভিমতে উদ্বুদ্ধ হলেন।

"অনুশীলন সমিতি"

অরবিন্দ কলিকাতা ত্যাগ করলেন। বরোদায় গমন করলেন।

অরবিন্দ দেখলেন, বঙ্গে যুবক-বিপ্লবীদল গঠন করা প্রয়োজন।

সেই সময়ে বরোদায় এক মহামনা বাঙ্গালী যুবক ছিলেন। তাঁর নাম যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন সৈন্য বিভাগে। অরবিন্দ তাঁকে বললেন, ভাই, বঙ্গদেশে যাও। বিপ্লবী যুবকদল গঠন কর।

অরবিন্দ তাঁর ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারকেও বঙ্গদেশে প্রেরণ করলেন বিপ্লবের অনল প্রজ্বলিত করার জন্য। অবিনাশ ভট্টাচার্য নামক এক যুবক এই দলে যোগদান করলেন। ঐ থেকেই কলিকাতায় সুবিখ্যাত "অনুশীলন সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হল। মুসলিম যুবজনেরাও

এই দলভুক্ত হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হলেন। অনুশীলন সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা হলেন ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র।

বিপ্লব সাধনায় দীক্ষাগ্রহণকালে, দীক্ষাগ্রহণকারীর এক হস্তে থাকত কৃপাণ খরশান, অন্য হস্তে পবিত্র গীতা হ'ত শোভমান। দীক্ষাগ্রহণকারীরা ভারতকে স্বাধীন করার জন্য স্বীয় জীবন ব্যয়িত করার শপথবদ্ধ হতেন।

অনুশীলন সমিতির শাখাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হল বঙ্গের কোন কোন জেলায়। মূল কেন্দ্র হল কলিকাতায়। ভগিনী নিবেদিতা, প্রমথ মিত্র এবং আরও কয়েকজন হলেন কলিকাতা কেন্দ্রের কর্ণধার। অরবিন্দের উপার্জিত অর্থ এই কেন্দ্রে এসে ভারতের স্বার্থে ব্যয়িত হত। মেদিনীপুরে অবস্থিত কেন্দ্রটি প্রশংসনীয় উদ্যম প্রদর্শন করতে লাগল। বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদি কিরূপে চালনা করতে হয়, সেই কেন্দ্রে সেই শিক্ষাও প্রদান করা হত। লাঠি সঞ্চালন, অশ্বারোহণ এবং নানারূপ ব্যায়াম নানা কেন্দ্রেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু সর্বোপরি ছিল বিপ্লব-পথে ভারতকে স্বাধীন করার মহার্ঘযুত আদর্শ।

সখারাম গণেশ দেউস্কর

ভারতের জনজাগরণ—গণজাগরণ—কি ক'রে হবে, কি করলে ভারত স্বাধীনতাসংগ্রামী হয়ে উঠবে,—অরবিন্দের তখন সততই সেই চিন্তা। তিনি স্থির করলেন, ভারতের রাজনৈতিক দুর্দশা যে কত বিপুল, সেটা দেশের মানুষকে জানানো প্রয়োজন। সেইজন্য চাই পুস্তক।

কে তখন হলেন সেই পুস্তকের প্রণেতা?

অবাঙ্গালী সখারাম গণেশ দেউস্কর। সখারাম তখন ছিলেন

বাঙ্গালা "হিতবাদী" পত্রিকা-র সহকারী সম্পাদক। তিনিই রচনা করলেন "দেশের কথা" ভারতের ব্যথার কথা।

"দেশের কথা" দেশের মধ্যে প্রচারিত হ'ল প্রচুর পরিমাণে।

দেশাত্মবোধের বিকাশে, "দেশের কথা" এই দেশের যতেষ্টই সেবা করছে।

হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের প্রতি হয়ে উঠতে লাগলেন প্রীতিমান ঐ "দেশের কথার" দৌলতেই।

আজ যখন-তখন শ্রবণ করতে পাওয়া যায় "স্বরাজ" শব্দটি।

স্বরাজ শব্দটি প্রথম প্রচারের প্রশংসা কার প্রাপ্য?

সখারাম গণেশ দেউস্করের প্রাপ্য।

সখারাম গণেশ এই দেশে বিতরণ করেছেন গণজাগরণের সন্দেশ।

সখারাম গণেশ দেউস্কর ভারতের পরাধীনতার অন্ধকার অপনোদনের এক ভাস্কর।

ইংরাজ স্বরাজদানে নারাজ

বঙ্গদেশে "দেশের কথা" প্রচুর প্রচারিত হচ্ছে। মানুষ দেশের কথা চিন্তা করছে; দেশকে দুর্দশামুক্ত করতে চাইছে।

ভারতের বিদেশী শাসক ও শোষক ইংরাজ ভারতকে স্বরাজদানে নারাজ। ইংরাজ সোনার ভারত তাদের গ্রাসমুক্ত হওয়ার আশঙ্কায় অধীর হয়ে উঠল।

ভারতের তখনকার বড়লাট ভারতের প্রতি দুর্জন কার্জনের নিকট হতে তখনই ভারতকে যন্ত্রণাদানের মন্ত্রণা ছুটে গেল ইংলণ্ডে: এই দণ্ডে বঙ্গদেশকে দুইভাগ করে ফেলা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ থাকবে হিন্দুপ্রধান; পূর্ববঙ্গ থাকবে মুসলিমপ্রধান;—তা হলেই, তারা প্রায়ই থাকবে যুযুধান—প্রীতি তার মধ্যে থাকবে না; ভ্রাতৃভাব

তাদের মধ্যে জাগবে না, তারা এক সঙ্গে স্বাধীনতা সাধনা-রঙ্গে লাগবে না।—তাহলেই, বৃটিশের হস্তের পরাধীনতা-পাশ ভারতকে করতে থাকবে সুচির সর্বনাশ।

দুর্জন কার্জনের সেই পৈশাচিক প্রস্তাব পূর্ণ সমর্থন প্রাপ্ত হ'ল ভারতের প্রতি ভণ্ড ইংলণ্ডের। বরোদায় অবস্থিত অরবিন্দ সেই বার্তা শ্রবণ করলেন। তিনি ছুটি নিয়ে ছুটে এলেন কলিকাতায়।

তখনও প্রকাশ্য আন্দোলনে তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন না। কলিকাতা নগরীর নামযাদা ব্যক্তিদের অগ্রবর্তী ক'রে, অরবিন্দ এক প্রকাণ্ড কাণ্ড সংঘটিত করলেন—বিরাট এক প্রতিবাদ-সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। সেই সভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হ'ল "স্বদেশী প্রস্তাব"।

"স্বদেশী প্রস্তাবে" এইরূপ উক্ত হ'ল: বৃটিশের কুশাসন ও শোষণ ভারতের শক্তি করছে দমন। তাই আমরা ঐ বিদেশীদের বিরুদ্ধে লড়ব। আমরা বৃটিশ দ্রব্য বর্জন করব। আমরা যথাসম্ভব স্বদেশী দ্রব্য—ভারতীয় দ্রব্য—ব্যবহার করব। আমাদের মধ্যেকার বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা আমরাই করব—ইংরাজের তৈয়ারী আদালতের দ্বারস্থ হব না। আমরা প্রতিষ্ঠিত করব আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়ে আমাদের বালক-বালিকারা অধ্যয়ন করবে। ইংরাজের তৈয়ারী স্কুল-কলেজ আমরা বর্জন করব।

ঐ ন্যায়সংগত স্বদেশী প্রস্তাবের ফলে, ভারত-বিদ্বেষী বিদেশী শাসক ও শোষক সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

স্বাধীনতার সাধনায়, এই দেশের মধ্যে তখন চলতে লাগল স্বদেশী ভাব ও স্বদেশী অবস্থা গঠিত করে তুলবার কর্মপ্রচেষ্টা। আর অন্তরালে চলতে লাগল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারা সশস্ত্র বিদেশী শাসককে মশকের মতো ধ্বংস ক'রে দেওয়ার অগ্নিসাধনা।

খ্রীষ্টীয় ১৯০৫ সাল। তখন ভারতের প্রতি প্রীতিহীন ইংরাজ বড়লাট দুর্জন কার্জনের ক্রূরতা করাল।

ইংরাজ সরকার ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আমাদের বঙ্গদেশকে বিদ্বেষবশে, দুই আলাদা প্রদেশে বিভক্ত করল। বঙ্গদেশ হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ।—এক দেশ হয়ে পড়ল দুই দেশ।—আর তার মূলে বিদেশীর দ্বেষ!

কিন্তু এই দেশ নীরব রইল না। তখনকার সাধ্যমত আহব ঘোষণা করল। লোকে উপবাস করল; বঙ্গের প্রান্তবর্তী সমুদ্রের তরঙ্গনির্ঘোষবৎ সমগ্র দেশের মধ্যে কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনি উঠল: বন্দে-মারতম্—মাতাকে বন্দনা করি—স্বদেশমাতাকে বন্দনা করি।

বঙ্গের সর্বত্র সভা অনুষ্ঠিত হ'ল। শপথ হল: বিলাতী বর্জন করি; স্বদেশী গ্রহণ করি। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অবতীর্ণ হল রাজপথে। তাদের বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত ও স্বনিত হ'ল স্বদেশী সংগীতে—ভারতের জাগরণের গীত। মানুষের মনের আগুন বাইরে মূর্তি পরিগ্রহ করল—জ্ব'লে উঠল। সেই আগুনের ইন্ধন হ'ল বিলাতী বস্ত্ররাশি। সেই অনল বিদেশী শাসকের দিকে চেয়ে হাসল অট্টহাসি। রবীন্দ্ররচনা "বাংলার মাটি, বাংলার জল" ঐ সময়ের মহামন্ত্র।

বঙ্গের আকাশ-বাতাস সঞ্চার করল অগ্নিনিঃশ্বাস! সুপ্তিহীন দেশ ব্যগ্র হ'ল পরাধীনতার অবলুপ্তি সংঘটনে।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল বারাণসীতে, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। নরমপন্থী নেতারাই তখন সেই কংগ্রেসের কর্ণধার। কলিকাতার পূর্বোক্ত সভার সেই "স্বদেশী প্রস্তাব" যাতে কংগ্রেসের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য অরবিন্দ,

প্রকাশ্যে অবতীর্ণ না হয়েও চেষ্টা করলেন বারংবার। কিন্তু চারটি কর্মকাণ্ডযুক্ত সেই প্রস্তাব কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করল না।

কেবলমাত্র বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ প্রস্তাব এবং বিলাতী দ্রব্য বর্জন প্রস্তাব কংগ্রেসের অনুমোদন প্রাপ্ত হ'ল।

বঙ্গভঙ্গ হল বটে, বঙ্গভূমি দুইভাগ হয়ে গেল বটে কিন্তু সেই দুইভাগের মানুষের মন দুই ভাগ হয়ে গেল না—এক রইল—ঐক্যবদ্ধ ও সখ্যবদ্ধই রইল।

দেশ বিভক্ত হ'লেও, দেশের সন্তানেরা রইল দেশের প্রতি অনুরক্ত। অন্যায়ের নিকটে মস্তক অবনত না করার জন্য হয়ে রইল শক্ত ও শাক্ত।

ভারতকে স্বরাজদানে নারাজ ইংরাজ দেখল, ভারতবাসী, আবেদন-নিবেদনের বাঁশীর পন্থা পরিত্যাগ ক'রে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য অসির পন্থা অবলম্বন করছে।

ইংরাজ তখন আইনের জাল বিস্তার করল স্বাধীনতালিপ্সুদের বেসামাল করবার জন্য। ন্যায়সংগত স্বাধীনতাবাণী ঘোষণা ও প্রচার করার সভাসমিতি জব্দ ও স্তব্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করল। "বন্দে-মাতরম্"-কে মেরে ফেলবার ব্যবস্থা করল। পীড়নবলে স্বাধীনতার রণ খতম ক'রে দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু বঙ্গের তথা ভারতের প্রাণশক্তি, শক্তি অস্ত্রোপম হয়ে, স্বাধীনতার অমৃতস্বাদ ও সাধ আয়ত্ত করার কর্মে মত্ত হয়ে উঠল—বাঁধন টুটল, দলে দলে ছুটল স্বাধীনতার স্বর্ণমঞ্চ অভিমুখে, দীপ্ত মুখে ও ক্ষিপ্ত বুকে।

বরোদা হতে বঙ্গে

বরোদায় অরবিন্দ তখন বন্দ্যপুরুষ। তিনি তখন ছাত্রদের প্রিয়, জনগণের প্রিয়, মহারাজার প্রিয়।

আর এদিকে তিনি ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে, তোষামোদের তমোগুণের পথ বর্জনবাদী, রজোগুণের এবং ওজগুণের উৎসাহদাতা।

তিনি অনুভব করলেন, বরোদা হতে বঙ্গে তাঁর আগমন প্রয়োজন। —পরাধীনতা পারাবারের পরপারে স্বাধীনতার স্বর্ণ সৈকতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য বিপ্লব-প্লব বা বিপ্লব-ভেলা বিরচনে তাঁকে প্রয়োজন। তিনি তখন বরোদার কর্মক্ষেত্র হতে দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করলেন, কিন্তু সবেতন বিদায় পেলেন না। তখন চলেছে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ।

অরবিন্দ আগমন করলেন কলিকাতায়। কিছুকাল পরে, আবার বরোদায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তারপর, একদিন তিনি বরাবরের জন্য বরোদা ত্যাগ করলেন। আগমন করলেন বঙ্গে, সম্পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য স্বাধীনতার সংগ্রামরঙ্গে।

যদি না থাকে স্বাধীনতা, তা হ'লে, জীবনে এসে যায় স্বাদহীনতা। তাই স্বাধীনতা, মানুষের চাই-ই চাই।—স্বাধীনতাহীন যে মনুষ্যজীবন, সে তো একটা মরুভূমি বা মরাভূমি।

বিদেশী শাসকের বিদ্বেষবিদ্ধ বরিশাল সম্মেলন

বরিশাল জেলা বর্তমানে বাংলাদেশে।

রবিশাল সুজলা; রবিশাল সুফলা, বরিশাল শ্যামলা। বরিশাল লতা-দ্রুম-দুগ্ধ-ধান্য-মৎস্য-সমাকুল। বরিশালের তটিনী তরঙ্গরঙ্গিণী; বরিশালের উদ্যান-কানন বিহঙ্গের কলগানে নিত্য নিমগন। বর্ষাগমে, বরিশালের গগন বর্ষণ করে বিপুল বৃষ্টি; সে যেন আসলে মিষ্টি, মানুষকে মিষ্টিমুখ করানোর জন্যে।

বঙ্গ-ভঙ্গ-বেদনা বিদ্ধ বাঙ্গালী স্থির করল, বরিশালে স্বদেশী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেই সম্মেলেন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ধ্বনিত করা হবে প্রতিবাদ—প্রতিবাদও এক প্রকার জেহাদ।

আর, ওদিকে, বরিশালের তখনকার ভারতবিদ্বেষী বিদেশী জেলাশাসক ঘোষণা করল: ঐ সম্মেলন হতে দেওয়া হবে না; কেউ যেন সম্মেলন করতে অগ্রসর না হয়।

কিন্তু বিদেশীর ঐ কেউ কেউ শ্রবণ ক'রে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও, নিরস্ত হলেন না। অরবিন্দও ছিলেন সেই অরিন্দমদশের এক অগ্রনায়ক।

নেতৃবৃন্দ বৃন্দারকবৎ বা দেবতাবৎ অগ্রসর হলেন সম্মেলনস্থল অভিমুখে। ব্যোম মণ্ডল বিধূনিত ক'রে ধ্বনিত হতে লাগল "বন্দে-মাতরম্" আহ্বান।

তৎক্ষণাৎ, শ্রবণ ক'রে সেই আহ্বান, বিদেশী শাসকের পুলিশদল হ'ল ধাবমান। তাদের সমুদ্যত দণ্ড পতিত হল সম্মেলন অভিলাষীদের সর্বশরীরে। মৃত্তিকা সিক্ত হ'ল স্বদেশসেবকের রুধিরে। ভারতের

সেই ছেলেরা যতবার প্রাপ্ত হতে লাগলেন প্রহার, তাঁদের কণ্ঠ হতে "বন্দেমাতরম্" প্রবাহিত হতে লাগল তদপেক্ষা অধিকবার। আর ধ্বনিত হল ভারতবিদ্বেষী বিদেশীদের প্রতি ধিক্কার।

সম্মেলন সুসম্পন্ন হওয়া অবস্তব হ'ল।

অতঃপর অরবিন্দ কি করলেন?

অরবিন্দ বিশিষ্ট নেতা বিপিনচন্দ্র পাল মহোদয়ের সমভিব্যাহারে পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে পর্যটন করতে লাগলেন। স্বদেশসেবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রচার করতে লাগলেন।—সেই প্রচার, সে যেন অন্ধকারে আলোক সঞ্চার!

ঐ সময়ে, লক্ষ্য করা হল যে, কেবলমাত্র বক্তৃতাদ্বারা ভারতের জাতীয়তার বাণী প্রচার করলেই যথেষ্ট হতে পারে না, প্রচারের জন্যে চাই পত্রিকা।—সেই হবে একপ্রকার আলোক-বর্তিকা।

ভারতে যুগান্তরের জন্য "যুগান্তর"

পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করা—সেই তো যুগান্তর। সেই যুগান্তর। সেই যুগান্তরের জন্য "যুগান্তর" পত্রিকা প্রকাশিত হ'ল বাঙলা ভাষায়।

অরবিন্দের নাম তার ভিতরে নেই; নেই তাঁর ভাই বারীন্দ্রের নাম। যুগান্তর পত্রিকার প্রকাশক হলেন কে? অবিনাশ ভট্টাচার্য। তাঁরই নামে হতে লাগল পত্রিকার সকল কার্য।

যুগান্তরে কখনও কখনও অরবিন্দ-বারীন্দ্র রচনা প্রকাশিত হতে লাগল। বিদেশী শাসকের ভারত-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে যুগান্তরে স্বদেশী ভাব প্রচার করতে লাগলেন অনল-লেখনীধারী উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কোন কোন গুণী।

ভারতে বৃটিশের Brutish বর্বরতা কি পরিমাণ দৌরাত্ম্য করছে,

তার বিবরণ যুগান্তর পত্রিকা এই দেশের মানুষের অন্তরে পৌঁছিয়ে দিতে লাগত।—অতি কম মূল্যের সেই পত্রিকা অমূল্য সম্পদ বিকীর্ণ করতে লাগল বঙ্গের অঙ্গণে।

কিয়দ্দিন অতিবাহিত হতে না হতেই, যুগান্তর উদ্বুদ্ধ করল বাঙ্গালীর অন্তর। যুবজনেরা দলে দলে অতি কুতূহলে যুগান্তর অফিসে সমবেত হতে লাগল। জড়তার নিদ্রা ভাগল, জয়োন্মুখ জাতীয় ভাব জাগল।

প্রবন্ধ প্রকাশ-পন্থায়, যুগান্তরে প্রকাশিত হতে লাগল গেরিলা-যুদ্ধের কৌশল-কথা।

যুগান্তর প্রতিদিন দেশকে দিত ডাক: বাজাও জাতীয়তার ঢাক। ভারতে বিদেশী শাসন পুড়ে হোক খাক! ঐ যে ভারত-বিদ্বেষী বিদেশী শাসক, ওকে গণ্য কর মশক। অগ্নি এই দেশের উপাস্য।—এই দেশ কি করবে অন্য দেশের দাস্য? আমাদের আস্য হাস্যুক অগ্নিহাস্য!—ভস্ম হয়ে যাক দাস্য।

উঠ! জাগো!
কাজে লাগো?
বিদেশীকে কহ,
ভাগো! ভাগো!

যুগান্তর যুবজনদের কেবলমাত্র প্রাণকেই উদ্বুদ্ধ করল না, পাণিকেও উদ্বুদ্ধ করল। ভারতের স্বাধীনতা-রণে অগ্নি-অস্ত্র ধারণে যুবজনের হস্ত হল ব্যস্ত। যুগান্তর অফিস যেন হয়ে উঠল বিপ্লবপন্থীদের কেল্লা। দেশের স্বার্থের জন্য অর্থ আসতে লাগল বিপুল ভাবে। বিদেশীয় সরকারের এই দেশীয় অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারীও ঐ দলটিকে গুপ্তভাবে অর্থ দান করতে লাগলেন আকুলভাবে, ব্যাকুলভাবে।

অরবিন্দের অনুজ বারীন্দ্র হলেন এই দলের অগ্রনায়ক।

যুগান্তর পত্রিকা কর্তৃক ভারতে যুগান্তর সংঘটন-প্রচেষ্টা অগ্রসর হতে লাগল অমিতবেগে।

জাতীয় মহাবিদ্যালয়

এখনকার যাদবপুর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কি এখনকার ?

এখনকার নয়। তখনকার সেই যুগান্তর যুগের। সেই যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় মহাবিদ্যালয়। সেইটিই এখনকার ঐটি।

ভারতবাসীর জন্য চাই ভারতীয় শিক্ষা, সেইরূপ শিক্ষাদানের জন্য জাতীয় মহাবিদ্যালয় চাই। এই চিন্তা জাগ্রত হ'ল অরবিন্দ এবং অন্যান্যের চিত্তে।

পরাধীনতার অন্ধকারে প্রাণের প্রদীপ তখনও জ্বলছিল। তাই জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের জন্য বিত্ত ও চিত্ত দাতার অভাব হল না।

ভারতের স্বাধীনতাকে লক্ষ্য ক'রে যে মহাবিদ্যালয়, আমি দেব তার জন্য লক্ষ টাকা, বললেন যথার্থ সুবোধ রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক মহোদয়। একে একে গৌরীপুরের রাজা এবং আরও অনেকে এই মহাবিদ্যালয়ের জন্য দান করলেন অনেক অর্থ।

ভারতের সপ্ত ভাষা এবং ইউরোপের সপ্ত ভাষা, এই চতুর্দশ ভাষায় চৌকস অরবিন্দ হলেন সেই জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। মাসিক মাত্র দেড়শত টাকা বেতনে ঐ পদ তিনি গ্রহণ করলেন। মাসিক সাড়ে সাত শত টাকা বেতনের বরোদার কার্যটি তিনি ত্যাগ করলেন।

ত্যাগের দ্বারাই অমৃত লব্ধ হয়, উপনিষদের এই উক্তি অরবিন্দ স্বীয় জীবন মধ্যে মূর্ত ক'রে তুললেন।

সেই মহাবিদ্যালয়ে যোগদান করল উৎসাহী ছাত্রদল। সেইখানে জ্বলল ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির হোমানল। ভারতের ভাতিময় সন্তান হওয়ার সুমহান শিক্ষাপীঠ হ'ল সেই জাতীয় মহাবিদ্যালয়।

"নিউ ইণ্ডিয়া"—"বন্দেমাতরম্"

বঙ্গে জাতীয়তাবাদের মৃতসঞ্জীবনী বিস্তারের জন্য তখন রয়েছে "যুগান্তর"। কিন্তু সর্বভারতীয় ভ্রাতা-ভগিনীগণের মন-সমক্ষে জাতীয়তাবাদের বাণী বিস্তারের জন্য ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হ'ল।

একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা পূর্ব হতেই ছিল। তার নাম "নিউ ইণ্ডিয়া"।

বিশিষ্ট নেতা বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন "নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রিকার সম্পাদক।

বিপিনচন্দ্র অরবিন্দকে বললেন, "নিউ ইণ্ডিয়া" দৈনিক পত্রিকা হোক। তুমি সেই পত্রিকার জন্য লেখনী চালনা কর।

অরবিন্দ সম্মত হলেন। তখন "নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রিকার নামটি পরিবর্তিত হয়ে নূতন নাম হ'ল "বন্দেমাতরম্"। সেইটি হ'ল দৈনিক পত্রিকা। "বন্দেমাতরম্"-এর সম্পাদকীয় রচনা-সোনা অরবিন্দের লেখনী-খনি হতেই উদ্ভূত হ'তে লাগল। কিন্তু পত্রিকার সম্পাদক রূপে অরবিন্দের নাম প্রকাশিত হ'ল না।

ইংরাজী "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবি প্রকাশিত হ'তে লাগল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত যেন প্রত্যহ মূর্তি পরিগ্রহ করতে লাগল "বন্দে-মাতরম্" পত্রিকায়। সমগ্র ভারত ভাবুক-জনমণ্ডলী "বন্দেমাতরম্" পত্রিকাখানিকে তাদের প্রাণের প্রিয় বলে বরণ করলেন।

ইংলণ্ডের অনেক পত্রিকাও, "বন্দেমাতরম্"-এর রচনায় মুগ্ধ হয়ে, কোন কোন সময়ে সেই রচনা মুদ্রিত করতে লাগল।

অরবিন্দ তখন হলেন সমগ্র ভারতের অরবিন্দ; হলেন ভারতের অরিন্দম অরবিন্দ। অরবিন্দ হলেন সমগ্র জাতীর আনন্দ-অরবিন্দ।

"বন্দে মাতরম্" এবং "যুগান্তর" পত্রিকাদ্বয় তখন জাতীয়তার আলোক বিকীর্ণ করছে আলোক উৎসারী চন্দ্র-সূর্যের মতো; জাতীয়তার জীবন বারি সঞ্চার করছে গঙ্গা-যমুনার মতো।

শাসক-শোষক ইংরাজ দেখল, পত্রিকাদ্বয়ের এই প্রচেষ্টা পণ্ড করা প্রয়োজন। ভারতের বুকে ইংরাজ শাসনের গুরুভার চাপিয়ে রাখা তাদের স্বার্থের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন।

ইংরাজ শাসক তার নিজের তৈরী আদালতে উপস্থিত হল। অভিযোগ করল "যুগান্তর" পত্রিকার প্রকাশক অবিনাশ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে; এবং অরবিন্দের বিরুদ্ধে।

কি উপলক্ষ ক'রে সেই অভিযোগ?

"যুগান্তর" পত্রিকায় একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে; সেই রচনার ইংরাজী অনুবাদ করেছেন অরবিন্দ। সেই অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে "বন্দে মাতরম্" পত্রিকায়। সেই রচনা রাজদ্রোহের রচনা—এই হল ইংরাজ শাসক-শোষকের অভিযোগ।

অরবিন্দের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জাহির হল।

অরবিন্দ তখন কি করলেন? ভীতিবশে আত্মগোপন করলেন কি?

অরবিন্দকে ধরবার জন্য ইংরাজের পুলিশকে ধাওয়া করতে হল না। অরবিন্দ নিজেই ইংরাজের থানায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। সকলকে অবাক ক'রে দিলেন।

অরবিন্দ তখন জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। তিনি রাজদ্রোহের মামলায় বিজড়িত হওয়ার ফলে, উক্ত বিদ্যালয়ের কোন রকম ক্ষতিও হতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা ক'রে অরবিন্দ কি করলেন? তাঁর

বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু হওয়ার পূর্বেই জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ করলেন। অরবিন্দের জীবনে দেখা গেল ত্যাগের পরে ত্যাগ।

ইংরাজ শাসক-শোষক অরবিন্দ ও অবিনাশকে মামলার মহাপঙ্কে প্রোথিত করে ফেলবার প্রচুর চেষ্টা করল বটে কিন্তু তাদের সে প্রয়াস পণ্ড হ'ল।

স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা মনীষী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আদালতে উপস্থিত হলেন। বললেন, আমিই হচ্ছি "যুগান্তর" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির প্রণেতা।

বিদেশী শাসক-শোষকের মোকদ্দমার নাগপাশ অবিনাশ গ্রাসে সমর্থ হ'ল না—ভারত-ভক্ত অবিনাশ সেই মামলায় দণ্ডিত হলেন না। অভিযোক্তা পক্ষ এটাও প্রমাণিত করতে পারল না যে, অরবিন্দই "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার সম্পাদক।

ধর্মাধিকরণের প্রাক্‌বিচারকও অভিমত প্রকাশ করলেন, "বন্দে-মাতরম্" পত্রিকায় প্রকাশিত রচনারাজি রাজদ্রোহ-সম্বন্ধীয় আইনের আওতায় আসে না।

ঐ মামলার ফলে অরবিন্দ আর ইংরাজের কারাগারে বন্দী হলেন না। কিন্তু ভারতের মানুষের মনোদ্যানে তিনি বন্দী হয়ে পড়লেন প্রশংসার পুষ্পাসনে। সকলেই তাঁকে জানল, সকলেই তাঁকে চিনল, সকলেই তাঁকে চিন্ময় বলে জ্ঞান করল। "ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়ট" পত্রিকা বিপুল পুলক-ভরে প্রকাশ ও প্রচার করল, ভারতের আনন্দ অরবিন্দ ভারতকে পরাধীনতা-পশুর গ্রাস হ'তে বিমুক্তকরণ মানসে স্বীয় জীবন বলিদানে সমুদ্যত। অরবিন্দ সুমহান। তাঁর ভারতের ভাই-ভগিনীবৃন্দ তাঁকে করছে প্রণাম, পুষ্প প্রদান।

ভারতীয় কোটি কোটি মানবের প্রশংসা-প্রদীপের সম্মুখে তখন অরবিন্দ প্রদৃষ্ট হলেন।

কংগ্রেসের অধিবেশন (কলিকাতায় ও সুরাটে)

ভারতের জন্য স্বরাজ চাই—পূর্ণ স্বাধীনতা চাই,—এই ছিল অরবিন্দের অভিলাষ। কিন্তু ভারতে তখন এমন নেতাও ছিলেন যাঁদের মনের দৃষ্টি ভারতের স্বাধীনতার স্বর্ণমঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছাত না—তাঁরা চাইতেন, ভারত ইংরাজের রাজত্বেই থাকবে, তবে ভারতের পরাধীনতার শিকল একটু শিথিল অবস্থায় থাকলেই যথেষ্ট। কিন্তু অরবিন্দ বললেন, আমাদের "স্বরাজ"-এর অর্থ—ভারত-রাজ। ইংলণ্ড যেমন স্বাধীন, ভারতও থাকবে সেইরূপ স্বাধীন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দ। কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন। সভাপতি—দাদাভাই নৌরোজী।

দাদাভাই সকলকে বললেন, ওরে ভাই, আমরা ভারতের জন্য স্বায়ত্ত শাসন চাই। সেইটাই আমাদের "স্বরাজ"।

পরবর্তী বর্ষে, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন। সেখানে তখন ভারতের স্বরাজ-অভিলাষীবৃন্দ এবং নরমপন্থী দল। দুই দলই চান, তাঁদের দলের একজন হবেন অধিবেশনের সভাপতি। মুখের দ্বারা, অর্থাৎ বাক্যদ্বারা সেই বিষয়ের মীমাংসা হয়ে উঠতে পারল না। মারামারি, পাদুকা প্রক্ষেপ ইত্যাদি অধিবেশনটিকে পণ্ড ক'রে দিল।

যাঁরা চাইতেন স্বরাজ, তাঁদের হৃদয়রাজ অরবিন্দ কংগ্রেসের সেই অনুষ্ঠানেও প্রকাশ্যে আবির্ভূত হননি। তিনি ছিলেন দেহের অভ্যন্তরবর্তী প্রাণের মধ্যে।

"স্বরাজ বিনে শান্তি নাই"

স্বরাজ চাই।
স্বরাজ চাই।
স্বরাজ বিনে
শান্তি নাই।

এই চিন্তা তখন অরবিন্দ-অন্তরে সততই সন্তরে, সঞ্চরে। যোগ-বলে বলীয়ান হয়ে, ভারতের পরাধীনতা-দুর্ভোগ বিদূরীত করা সম্ভবপর হতে পারে—এইরূপ ধারণা অধীরতার লক্ষণ নয়। অরবিন্দের যোগাভ্যাস পূর্ব হতেই চলেছে। যোগ সাধনায় সাহায্য প্রাপ্তির জন্য একজন সুযোগ্য যোগীর সাহচর্য প্রাপ্তি প্রয়োজন। পুণায় সেরূপ যোগী ছিলেন একজন। তাঁর নাম বিষ্ণু ভাস্কর। সুরাটের কংগ্রেসের পরে অরবিন্দ গেলেন বরোদায়। যোগী বিষ্ণু ভাস্করের সঙ্গ অরবিন্দ পূর্বেঃ প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর সাদর আহ্বানে, বিষ্ণু ভাস্কর আগমন করলেন অরবিন্দের সন্নিধানে। যোগ সাধনায় নিগূঢ়-মার্গ সম্বন্ধে তিনি অরবিন্দকে প্রদান করলেন উপদেশ।

অরবিন্দ তাঁর এক শুভাকাঙ্ক্ষীর আবাসে একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠে অবস্থিত হলেন। বিষ্ণু ভাস্কর রইলেন তাঁর সমভিব্যাহারে।

সেই সাধনা চলল তিন দিবসব্যাপী। সেই উদ্যমের ফলে, অরবিন্দের অন্তরে উদ্ভূত হ'ল এক অনুপম অনুভূতি—নশ্বর জীবনে ঈশ্বর ভাব।

অদ্ভুত শক্তির উদ্ভব

কোন বিষয় অবলম্বনে কোন রচনা প্রস্তুত করা, কিংবা কোন বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করার জন্য সেই বিষয় সম্বন্ধে লেখক কিংবা বক্তার পূর্বেই চিন্তা করার প্রয়োজন হয়।

কিন্তু অরবিন্দের ঐরূপ যোগাভ্যাসের ফলে, তাঁর অন্তর্দেশে এক অদ্ভুত শক্তির উদ্ভব হ'ল। সেই শক্তির বলে তিনি কোন বিষয় সম্বন্ধে পূর্বে একটু মাত্রও চিন্তা না ক'রে ভাষণ দানে এবং নিবন্ধ রচনায় সমর্থ হতে লাগলেন।

বরোদা হতে তিনি বোম্বাইয়ে গমন করলেন, পুনায় গমন করলেন। বিষ্ণু ভাস্কর তাঁর সঙ্গী। অরবিন্দ তখন বন্দ্যনীয় ব্যক্তি। নানা সভায় ভাষণ দানের জন্য তাঁর প্রতি আসতে লাগল সাদর ও সসম্ভ্রম আহ্বান।

অথচ অরবিন্দের মনের অবস্থা তখন এরূপ যে, বক্তব্য তাঁর যেন কিছুই নেই, মন যেন শূন্যতার দ্বারা পরিপূর্ণ।

বিষ্ণু ভাস্কর মহোদয় অরবিন্দের নিকট হতে অবগত হলেন— অরবিন্দের অন্তরের অবস্থা। তিনি দীপ্ত বদনে হাস্য করলেন। বললেন, তোমার মন এখন শূন্যতা দ্বারা পরিপূর্ণ নয়, পুণ্যতা দ্বারা পরিপূর্ণ। তুমি ভাষণ দানের জন্য সভায় যাও। সভায় দাঁড়াও। সভাস্থ সকলকে অভিবাদন জানাও। নয়ন নিমীলিত ক'রে কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর। তারপর তোমার বদন হতে যে বাণী ব্যক্ত হবে, তা হবে শ্রোতৃবৃন্দের তৃপ্তিকর।

বোম্বাই নগরে বিরাট সভা। জ্ঞানী-গুণী, ধনী-মানী সেখানে সমুপস্থিত।

বিষ্ণু ভাস্করের পরামর্শ অনুসরণ ক'রে অরবিন্দ তদ্রূপ ভাবে সেই সভায় দণ্ডায়মান হলেন। সকলে দর্শন করল, তিনি শোভমান হলেন।

অরবিন্দ সকলকে জ্ঞাপন করলেন অভিবাদন, নয়ন করলেন নিমীলন। কিয়ৎকাল পরে নয়ন করলেন উন্মীলিত। তখন তাঁর আনন হ'তে আরম্ভ হ'ল ভাষণ। সেই ভাষণ হ'ল লোকচিত্তরঞ্জন।

ভারতের বৃটিশ শাসক ও শোষক ভারত-ভক্ত জননায়ক পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় মহোদয়ের প্রতি প্রয়োগ করল নির্বাসনদণ্ড।

রজনী গভীরা। সরোবরে অরবিন্দ নিমীলিত। জননায়ক অরবিন্দ শয্যায় সুপ্তিমগ্ন। কিন্তু তাঁর সুপ্তি ভঙ্গ করা হল। সেই দুঃসহ সংবাদ তাঁকে জ্ঞাপন করা হ'ল। তিনি তখনই শয্যা ত্যাগ করলেন। লেখনী ধারণ করলেন। প্রস্তুত হ'ল অকল্পিতপূর্ব যে রচনা, সে হ'ল খাঁটী সোনা। ক্ষণপরেই মুদ্রিত সেই রচনা পরবর্তী প্রভাতে ভারতীয় পাঠককে প্রদান করল স্বদেশের স্বাধীনতালাভের সাধনায় জাগৃতির প্রেরণা। সে রচনার বাক্যজাল ভারতের বিদেশী শাসককে করে ফেলল বেসামাল।

কিন্তু সেই রচনা-সোনায় নেই এমন কোন খাদ, যার সূত্র ধরে অরবিন্দকে বন্দী করবার জন্য কারাগারে ইংরাজ শাসক-শোষকের সাধ পূর্ণ হ'তে পারে।

অরবিন্দ অন্তরে তখন এক পরম ভাববন্যা। সুধন্যা গঙ্গার উপকূলে ঐ সময়ে তিনি কিছুকাল বসবাস করছিলেন, পানিহাটিয় দত্ত মহাশয়দের উদ্যান বাটিকায়। বিষ্ণু ভাস্কর ছিলেন তাঁর সমভিব্যাহারী দুইজনে সেই নিরজনে কাল কর্তন করছিলেন চিন্ময়-চিন্তনে।

ঐ সময় অরবিন্দ একই সঙ্গে রাজনীতি এবং ধর্মনীতি অনুসরণ করছিলেন। তা করছিলেন ভারতভূমির পরাধীনতা-দীনতা দূরীভূত করবার জন্য।

মহাভারত মহাগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, কুরুক্ষেত্রে সংহার-সমরের প্রারম্ভে, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীঅর্জুন গীতা গ্রন্থোক্ত সর্বসারতত্ত্বালোচনায় তন্ময়।

অরবিন্দ-অন্তর তখন অনুভব করছে, যে তিনি পরমেশ্বরের পাণি-পুত্তলিকা—ভগবানের হাতের ক্রীড়নক—পুতুল।

ঐ সময়ে অরবিন্দের সহধর্মিণীর নিকট অরবিন্দের প্রেরিত এক পত্র হতে ঐ ভাবটি আহরণ করা যায়। সেই পত্রের প্রতিটি ছত্র এক পরম পবিত্র সত্র।

বিদেশী বৈরী বিতাড়নে বোমা

পরাধীনতা-প্রস্তর-প্রেক্ষণে মানুষের জীবনে পশুদশা প্রাপ্তি সুনিশ্চিত। সেই পশু দশনকে পর্যুদস্ত করার জন্য—বন্দুক পরাধীন জাতির অতি বড় বন্ধু। আয়ুধ হয় তার আয়ুদ।

সেইহেতুই, ভারতের পরাধীনতা-দুর্গতি দূরীকরণকল্পে বোমা-বন্দুক অবলম্বিত হয়েছিল।

ইংরাজী Bomb (বম্) শব্দটিকে বঙ্গভাষায় উক্ত হয় বোমা। Bomb শব্দটির মূল কি? ব্যোম হতে নিক্ষিপ্ত হয় ব'লেই ঐ বিস্ফোরক অস্ত্র ইংরাজী ভাষায় Bomb ব'লে অভিহিত হয় না কি? সংস্কৃত ভাষায় ব্যোম শব্দটিই কি ইংরাজী ভাষার Bomb শব্দের মূল নয়?—এই ব্যাখ্যা খুবই যুক্তি সংগতই হয়।

তৎকালীন ভারতের বিদশী শাসক-শোষক ইংরাজের অস্ত্রবল ভারতকে ক'রে রেখে ছিল নিরস্ত্র দুর্বল। সেই দুর্বলকে সবল করবার জন্য চাই বোমা, চাই বন্দুক।—ভারতকে পরাধীনতা হতে উদ্ধার করার জন্য ঐ সব চাই।

কলিকাতা শহরের মাণিকতলা অঞ্চলে মুরারিপুকুর রোড। সেই স্থানে অবস্থিত ছিল অরবিন্দের একখানি উদ্যান বাটিকা। একতলা

এক বাড়ী। তৎসঙ্গে দুইটি সরোবর। অরবিন্দের অনুজ বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং বারীন্দ্রের অকপট বীর বন্ধুরা সেই উদ্যান-বাটিকায় এক গুপ্ত সমিতি সংগঠিত করলেন। সেইস্থানে সংগৃহীত হতে লাগল পিস্তল, বন্দুক ইত্যাদি ; আর প্রস্তুত হতে লাগল বোমা।

বারীন্দ্র-উপেন্দ্র উল্লাসকর প্রভৃতি বীরদের হস্ত সেই অগ্নি-অস্ত্র উৎপাদনে রইল ব্যস্ত। ভারত ভাবুক অন্যান্য যুবজনেরাও সেইস্থানে আগমন করতেন। বিপ্লবী-প্লব অবলম্বনে ভারতের পরাধীনতা-পারাবার উত্তরণই হল সকলের কর্মের সুমহান উদ্দেশ্য। কিন্তু তখনকার মতো মুখ্য উদ্দেশ্য হল, ভারতের স্বাধীনতার পথের অন্তরায় বিদেশী শাসকের ক্রূরকর্মা কর্মীদের পীড়নের অবসান সংঘটন, প্রয়োজন হ'লে তাদের পরলোকে প্রেরণ।

বিদেশী শাসকের যে সকল কর্মী বঙ্গদেশে পীড়নের বান বহিয়ে দিয়েছিল, তাদের মধ্যে কিংস ফোর্ড ছিল যেন এক ফণী। কিংস ফোর্ড ছিল প্রকৃত পক্ষে হিংসফোড, অথবা কলির কংস। তখনকার "সন্ধ্যা" পত্রিকা ছিল ভারতের স্বাধীনতার সুমহান সৈনিক। "সন্ধ্যা"র সম্পাদক ছিলেন প্রভাত-সূর্য সন্নিভ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

"সন্ধ্যা" পত্রিকায় "ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে" শীর্ষক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদেশী বৃটিশ শাসকের অভিমত, সেই প্রবন্ধ হয় রাজদ্রোহপূর্ণ।

বরেণ্য ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহোদয়ের বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা হয়। ব্রহ্মবান্ধব একজন পুরোহিতের বেশে আদালতে উপস্থিত হন। "সন্ধ্যা" মুদ্রাকরকে বরবেশে সজ্জিত ক'রে সঙ্গে নেন। ব্রহ্মবান্ধবের পরিধানে তখন রেশমী বসন, রেশমী চাদর গায়ে জড়ানো, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত। তাঁর সমভিব্যাহারে ব্যাণ্ড বাদ্য বাদক। সেই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দর্শন মানসে সেইখানে তখন লোকের ভিড়ে যেন এক অলৌকিক অবস্থা। পুলিশে ও সার্জেণ্টে লোকের প্রতি তাড়া করে। ভারতের সন্তান সুশীল সেন

তখন করে বুকটান। ভয় খায় না, হঠে না। এক সার্জেন্ট অল্প বয়স্ক সেই সুশীল সেনকে পাকড়াও করে। তৎক্ষণাৎ সুশীল সেনের একটা ঘুসি পড়ে সেই সার্জেন্টের মুখের উপর। পুলিশে সেই সাহসী সাবাস সুশীলকে ধ'রে ফেলে, বেঁধে ফেলে। ঐ কলির কংস হিংস-কোর্ড কিংসফোর্ড তখন ছিল সেই ধর্মাধিকরণের অধার্মিক হাকিম। সে হুকুম করে, দুঃশীল সুশীলকে আদালতের সম্মুখে দাঁড় করু, বেত মার।

তৎক্ষণাৎ সুশীল সেনের উপর হতে লাগল পুলিশের বেত্রাঘাত বারংবার। আর সুশীল সুশীলের কণ্ঠ হতেও ধ্বনি নির্গত হতে লাগল বারংবার: "বন্দেমাতরম্!" "বন্দেমাতরম্!"—সে এক রণ!—স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুপণ রণ—ঐ হিংসফোর্ড কিংসফোর্ড ছিল জেলাশাসক। পরে তার কর্মস্থল হল মজঃফরপুর।

ভারত ভাবুক বারীন্দ্র এবং তাঁর নেতৃত্বেচালিত বিশ্বস্ত বীর যুববৃন্দের বোমার লক্ষ্য হল সেই ক্রূরকর্মা কিংসফোর্ড। তখন চলেছে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে।

এ যুগের রাম ক্ষুদিরাম বসু—এবং ভারতের স্বাধীনতা উদ্ধারে উৎফুল্ল প্রফুল্ল চাকী চলে গেলেন মজঃফরপুরে। একদিন দুইজন ইয়োরোপীয় নারী একটা গাড়ীতে চড়ে যাচ্ছিলেন। প্রফুল্ল ক্ষুদিরামের মনে হ'ল, কিংসফোর্ড সেই গাড়ীতে রয়েছে। তখনই বোমা নিক্ষিপ্ত হল। সেই দুই নারী হ'ল নিহত। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল আত্মরক্ষার জন্য তৎপর হলেন। তারপর, বিভিন্ন স্থানে পুলিশের হস্তে পতিত হলেন। প্রফুল্ল অবিলম্বে তুললেন তাঁর হস্তের পিস্তল। করলেন আত্মহত্যা। ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন। ভারত-বিদ্বেষী বিদেশী শাসকের ফাঁসিকাষ্ঠ তাঁর জীবন করল বিনষ্ট।

মজঃফরপুরের সেই ঘটনার পরে একটি দিন হয়ে গেল ক্ষীণ, কালগর্ভে হল বিলীন, তারপর শেষরাত্রে দেখা গেল, কলিকাতার

মানিকতলার মুরারিপুকুর রোডের সেই উদ্যানবাটিকা পুলিশদল বেষ্টন করে ফেলেছে।

তখন সেখানে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা—অর্থাৎ, বারীন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র, উল্লাসকর, হেমচন্দ্র, উপেন্দ্র, প্রভৃতি তখনকার পুলিশের পাকা-খপ্পরে প'ড়ে গেলেন। কিন্তু ভারত ভাবুক সেই বীর যুবকবৃন্দ সেই অবস্থাতেও বুক টান ক'রেই রইলেন স্থির। তাঁদের অস্থির মধ্যে তখন অগ্নিবন্যা।

অরবিন্দ হলেন বন্দী

মুরারী পুকুরের ঐ মর্মভেদী ঘটনা সংঘটন কালে, অরবিন্দ তখন কোথায় ছিলেন? অরবিন্দ তখন ছিলেন কলিকাতায় গ্রে স্ট্রীটে একটি ভবনের উপরিতলে। সেই ভবনে অবস্থিত ছিল "নবশক্তি" পত্রিকার কার্যালয়।

অবিনাশ ভট্টাচার্য মহোদয়, অরবিন্দের সহধর্মিনী দেবী মৃণালিনী, এবং অরবিন্দের ভগিনী সরোজিনী তখন সেই স্থানেই ছিলেন।

ইংরেজের পুলিশ প্রভাত কালের পূর্বেই সেইস্থানে উপস্থিত হয়। অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করে তাঁর কটিদেশে রজ্জু বন্ধন করে। অবিনাশ ভট্টাচার্যকেও গ্রেপ্তার করে।

প্রধান পুলিশ কর্মী ক্রেগান অরবিন্দের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে।

সেই ঘটনা সম্বন্ধে অরবিন্দের অভিমত এইরূপ: "ক্রেগানের কথার ভাবে প্রকাশ পাইল যে, তিনি যেন হিংস্র পশুর গর্তে ঢুকিয়াছেন, যেন আমরা অশিক্ষিত হিংস্র স্বভাববিশিষ্ট আইন ভঙ্গকারী, আমাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা বা ভদ্র কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।"

ক্রেগানের সঙ্গে অরবিন্দের কিছুক্ষণ প্রচণ্ড বাক্‌বিতণ্ডা হ'ল। অতঃপর *gun* ধারী ক্রেগান স্তব্ধ হয়ে গেল।

অরবিন্দের মহত্ত্ব ও মর্যাদা তখন সুবিদিত। বিদ্যুৎবেগে সেই ঘটনার কথা পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল।

ভূপেন্দ্র বসু প্রভৃতি গণ্য-মান্য জনেরা সত্বর সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। তাঁদের অনুরোধে, অরবিন্দের কটিদেশ হতে রজ্জু অপসারিত করা হ'ল।

পুলিশ সেইস্থানে বোমা পেল না, বন্দুক পেল না, পিস্তল পেল না। গোলাবারুদ পেল না। পেল শুধু কিছু কাগজপত্র।

পুলিশের হস্তে বন্দী হওয়ার সময়ে, অরবিন্দ মৃত্তিকায় একটা শতরঞ্জির উপর শয়নে ছিলেন। সেইরূপ অবস্থা দর্শনে, অরবিন্দের প্রতি পুলিশের বিদ্রূপবাক্য বর্ষিত হল: তুমি নাকি বিদ্বান! অথচ এইরূপে মৃত্তিকার উপর শয়ন ক'রে রয়েছ!—তোমার কি লজ্জা নাই?

যে মূঢ়ের মুখ হতে ঐরূপ বাক্য বহির্গত হ'ল তার নিজেরই যে ঐরূপ বাক্য প্রকাশে লজ্জা বোধ করা উচিত। সে বোধ তার ছিল না। অরবিন্দ তখন নীত হলেন কলিকাতার আলিপুরস্থ কারাগারে।

স্বাধীনতা সাধনা বানচাল করার ব্রিটিশ চাল

আলিপুর-ষড়যন্ত্র মামলা

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সশস্ত্র-সাধনা বানচাল করার জন্য বিদেশী শাসক-শোষক বৃটিশের বর্বরতা সততই ব্যস্ত ছিল।

তারা যে মামলা দায়ের করল, সেই মামলাকে বলা হয় 'আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা'।

স্বাধীনতার সাধক মোট ৩৬ জন ভারতভক্তের বিরুদ্ধে বিদেশী বৃটিশ শাসক তাদেরই গঠিত বিচারালয়ে অভিযোগ করল: এই সব আসামী ইংলণ্ডের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র করেছে; ভারতে আইন প্রতিষ্ঠিত ইংরাজ রাজ্যকে ইংরাজের হস্তচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করেছে।

ষড়যন্ত্র বলে প্রমাণিত করার জন্য বোমা বন্দুক গুলিগোলা পিস্তল প্রভৃতি মোট হাজার পাঁচেক বস্তু প্রদর্শনের ব্যবস্থা হ'ল। দলিল পত্রাদিও হ'ল হাজার চারেক। আর সাক্ষীর সংখ্যাও দুই শতের ন্যূন নয়।

সেই মোকদ্দমার বিচারক হলেন বীচক্রফ্‌ট নামক একজন ইংরাজ। তিনি তখন ছিলেন কলিকাতার আলিপুরের দায়রা জজ।

স্বাধীনতার সাধনা বানচাল করার ঐ মামলা চলল বারটি মাস।

সেই ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ভারতভাবুক ভারত ভক্তরা তখন পুলিশের গ্রাসে কারাগারে আটক। কিন্তু তাঁদের দেহ তখন বন্দী হলেও, তাঁদের মধ্যেও এক-আধজন ব্যতীত অন্য কাহারও মন তখন মুমূর্ষু হয়ে পড়েনি।

অভিযুক্ত বীরবৃন্দ সকলেই প্রায় আত্মবিশ্লেষণ হিসেবে বললেন:

স্বদেশের সেবার জন্য কর্মসম্পাদনই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। ভারতভূমিকে আমরা পরাধীনতার নাগ-পাশ হতে বিমুক্ত করতে ইচ্ছুক। বিদেশী শাসক এই দেশ হতে বিতাড়িত হওয়া প্রয়োজন।

অরবিন্দের প্রকাশিত অভিমত হ'ল এইরূপ: আমি আমার স্বদেশের স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিয়াছি। ইহা যদি একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে, আমি প্রধান অপরাধী। স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারিত করা যদি একটা বেআইনী কর্ম হয়, তাহা হইলে, আমি অপরাধী, একথা অস্বীকার করি না। জাগ্রত অবস্থায়, আমার চিন্তা—স্বাধীনতা; আমার সুপ্তির অবস্থায়, আমার স্বপ্ন—স্বাধীনতা। আমি অকুণ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে চাই, স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করার কর্ম আইনের কোনও ধারা অনুসারেই একটা অপরাধ নহে।

সেই বিপ্লবীদলের একজনের নাম ছিল নরেন্দ্র গোস্বামী। তিনি, পুলিশের হস্তে বন্দী হওয়ার পর, তখন আর তাঁর ভারত-ভাব, ভারত-ভক্তি অটুট রাখতে সমর্থ হলেন না—বিপ্লবী দলের নানা তথ্য পুলিশের নিকট প্রকাশিত করতে লাগলেন—ভারতের স্বাধীনতা সাধনার বিরুদ্ধে লাগলেন। তখন বন্দী বিপ্লবীদের চেষ্টায় কারাগারের মধ্যেই এসে গেল পিস্তল, দুইবীর বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেন্দ্র বসু সরকারী সাক্ষী নরেন্দ্র গোস্বামীকে শেষ ক'রে দিলেন।

সেই অভিযোগে, সত্যেন্দ্র বসু এবং কানাইলাল দত্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ফাঁসি কাষ্ঠ তাঁদের জীবন করল নষ্ট।

স্বাধীন ভারত মনে করে, সেই সত্যেন্দ্র, সেই কানাই, তাঁদের ভারত ভক্তির আর তুলনা নাই।

সেই মামলার আসামী অরবিন্দ, এবং বিচারক বীচক্রফ্‌ট ইংলণ্ডে ছিলেন সতীর্থ বা সহপাঠী। বিচারক বীচক্রফ্‌ট আদলতে আসামী

অরবিন্দকে আলাদা উপবেশন-স্থান প্রদান করতে চাইলেন। কিন্তু ভারতের অরবিন্দ ঘোষ তা চাইলেন না। তিনি অন্যান্য আসামীর সঙ্গে অলংকৃত করলেন আসামীর উপবেশন আসন।

আমাদের পরম সম্মানার্হ সেই আসামীরা এই দেশের অনেক আইন-জীবীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তখনকার ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ—পরবর্তী কালের ভারত-ভাস্কর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ—সেই মামলায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন।

বরেণ্য ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তখন সেই ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার বিচারক এবং জুরীদেরে লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন, "ইহার বিচার অদ্য এই ধর্মাধিকরণেই যে চলিতেছে তাহা নহে, এই খানেই ইহার শেষ নহে। ইতিহাসের সুউচ্চ ধর্মাধিকরণেও ইঁহার বিচার চলিবে। এই বিচার সম্বন্ধে আমাদিগের বিচার-বিতর্ক, বাক্-বিতণ্ডা একদা যখন থামিয়া যাইবে,—অদ্যকার এই উত্তেজনার কোন প্রকার চিহ্নই যখন বর্তমান থাকিবে না, আর অরবিন্দ ঘোষও একদা চলিয়া যাইবেন এই পৃথিবী হইতে, তখন কি হইবে? সেই সময়ে সেই সুদূর কালেও এই মর্ত্যের মানুষ তাঁহাকে স্বদেশপ্রেমের কবি বলিয়া, জাতীয়তার ঋষি বলিয়া, মানব-প্রেমিক বলিয়া শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করিবে। আর যে বাণীর নিমিত্ত অদ্য তিনি অভিযুক্ত, তাঁহার সেই বাণীর তরঙ্গ প্রতিধ্বনিত হইবে কেবল মাত্র এই ভারতবর্ষেই নহে—সাগরের পরপারের দূর দেশান্তরেও তাহা নিত্য প্রতিধ্বনি জাগ্রত করিয়া তুলিবে।"

সেই মোকদ্দমার যবনিকা পাত হয় খ্রীষ্টীয় ১৯০৯ সালের মে মাসের প্রথম ভাগে।

অরবিন্দের অবস্থানদ্বারা অলংকৃত আলিপুর কারাগারের সেই কুঠরীর দ্বারে বর্তমানে তাঁর নামের এক স্মরণফলক অলংকৃত

হয়েছে। আলিপুর মামলার সমুদয় দলিলপত্র পণ্ডিচেরী আশ্রমে প্রদত্ত হয়েছে।

তখনকার দিনে, সেই মামলার আসামীদের পক্ষ হয়ে সরকার পক্ষের বিরুদ্ধতা করা বিপুল হৃদয়বত্তা এবং অসম সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করে।

বন্দী অরবিন্দ আনন্দী অরবিন্দ

আগ্নেয় অস্ত্রবলে ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের অবসান সংঘটিত করার ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আসামীরূপে অরবিন্দ কারাগারে বন্দী ছিলেন এক বর্ষকাল। সেই উজ্জ্বল ভাল পুরুষ প্রবর তখন কিরূপ অবস্থায় ছিলেন?

নির্জন কারাকক্ষে বন্দী ছিলেন প্রথম এক মাস। এমন কি, পুস্তকও পাঠ করতে হত না। পরে পুস্তক পাঠ করতে দেয়া হয়েছিল।

সেই দুরবস্থার অবস্থায় অরবিন্দ কিরূপে কাল কর্ত্তন করেছিলেন?

কাল কর্তন করেছিলেন বিশ্ববিধাতার ধ্যানে মগ্ন হয়ে।

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

—যে অবস্থা লাভ ক'রে, অন্য কোন লাভকে তদপেক্ষা অধিক ব'লে গণ্য করেন না, এবং যে অবস্থায় অবস্থিত থেকে মহাদুঃখেও বিচলিত হন না, সেই অবস্থা হচ্ছে সেই অবস্থা।

ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্তি অসম্ভব নয়। মানুষের জীবনে দুঃখ আছে। সেই দুঃখকে সুক্ষ্ম করতে হলে, দূর করতে হলে, মনকে নির্বিকার ক'রে তোলা প্রয়োজন হয়।

কেটে গেল এক মাস নির্জন কক্ষে নির্মম নিষ্ঠুর কারাবাস। অরবিন্দ সম্প্রাপ্ত হলেন তাঁর ভাস,

যস্য ভাসা সর্বম্ ইদং বিভাতি।

—যাঁর আলোক দ্বারা এই সমুদায় বিশ্ব প্রকাশিত হচ্ছে।

তার পরে, অরবিন্দকে অন্য সকলের সঙ্গে অবস্থান করার সুবিধেটুকু প্রদত্ত হয়।

কিন্তু সবাই যখন থাকতেন নানরূপ নির্দোষ রঙ্গে, অরবিন্দ তখনও থাকতেন ঈশ্বরসঙ্গে—ঈশ্বর-ধ্যানে—চিন্ময়-চিন্তনে।

ঐ সময়ে, অরবিন্দ প্রায়ই চব্বিশ ঘণ্টার অর্ধভাগ অথবা তদপেক্ষাও অধিক সময় পর্যন্ত কোন প্রকার আহার্য গ্রহণ করতেন না। নিদ্রাও ছিল খুই অল্পকাল ব্যাপী। তাঁর সর্ব তনুতে এক দিব্য বিভা দর্শন করা যেত। নেত্রদৃষ্টি প্রশান্ত, অচঞ্চল।

সেই কারাবাস এবং মোকদ্দমা সম্বন্ধে অরবিন্দের বর্ণনা এইরূপ: "অনেক দিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করেছিলাম; উৎকট আশা পোষণ করিয়াছিলাম জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে, প্রভুভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র বাসনার টান, নানা কর্মের আসক্তি, অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহা পারি নাই। শেষে পরমদয়ালু সর্বমঙ্গলময় শ্রীহরি সেই সকল শত্রুকে এক কোপে নিহত করিয়া তাহার সুবিধা করিলেন, যোগাশ্রম দেখাইলেন, স্বয়ং গুরুরূপে, সখারূপে সেই ক্ষুদ্র সাধন কুটিরে অবস্থান করিলেন। সেই আশ্রম ইংরাজের কারাগার।"

অতঃপর, অরবিন্দ একদিন ভগবৎবাণী শ্রবণ করলেন, "যখন তোমাকে জেলে বন্ধ করা হয়, তোমার হৃদয় কি হতাশ হয়ে পড়েনি, তুমি কি আমায় ডেকে বলনি, কোথায় আমার অভয় ছায়া? এখন দেখ ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে চেয়ে, সরকার পক্ষের উকিলের দিকে চেয়ে।"

ঐরূপ অবস্থার পরে, অরবিন্দের বাণী এইরূপ: "আমি দেখলাম,

কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখতে পেলাম না, দেখলাম সেখানে বাসুদেবকে, দেখলাম বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট রয়েছেন নারায়ণ। সরকার পক্ষের উকিলের দিকে তাকালাম, সেখানে আমি সরকারী উকিলকে দেখতে পেলাম না, সেখানে বসে রয়েছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, আমার প্রিয় বন্ধু সেখানে বসে হাসছেন। তিনি বললেন, "........আমি রয়েছি সকল মানুষের মধ্যে, আমি তাদের সকল কর্ম, সকল কথাকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করি।.......তোমার কোন ভয় নেই।......তারপর ......আমার পক্ষ সমর্থনের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল সহসা তা পরিবর্তিত হয়ে গেল, দেখলাম আর একজন কাউন্সেল আমার পক্ষ সমর্থন করবার জন্য দণ্ডায়মান হয়েছেন।......তিনি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস। যখন তাঁকে দেখলাম, আমি নিশ্চিন্ত হলাম। .....আমি ভেতর থেকে বাণী শুনলাম,—"তোমার পায়ে যে জাল জড়ানো হয়েছে, তা থেকে এই মানুষটিই তোমাকে উদ্ধার করবে।........"

ষড়যন্ত্র মামলার জাল হতে নিষ্কৃতি প্রাপ্তির পরে, অরবিন্দ আগমন করলেন কলিকাতায় তাঁর আত্মীয় "সঞ্জীবনী" পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহোদয়ের ভবনে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। অতঃপর অরবিন্দ কলিকাতার নিকটবর্তী উত্তরপাড়ার ধর্মরক্ষিণী সভার আহ্বানে এবং অন্যান্য স্থানে যে সকল ভাষণ দেন, সেই সবের মধ্যে সেই ভাসের—সেই মহা আলোকের—উপলব্ধির বার্তাই বিঘোষিত হয়।

উত্তরপাড়ায় প্রদত্ত অরবিন্দের ভাষণের কিয়দংশ এইরূপ: "আমি বলি না যে, জাতীয়তা একটা বিশ্বাস, একটা ধর্ম, একটা নিষ্ঠা; আমি বলছি, আমাদের পক্ষে সনাতন ধর্মই হচ্ছে জাতীয়তা।....যখন সনাতন ধর্মের অবনতি হয়, তখনই জাতির অবনতি হয়, আর

যদি সনাতন ধর্মের ধ্বংস হওয়া সম্ভব হত, তাহলে সনাতন ধর্মে, এইটিই হচ্ছে জাতীয়তা।........"

"তুমি জান, আমি মুক্তি চাই না, অপরে যা চায় এমন কোন জিনিষই আমি চাই না। আমি শুধু চাই এই জাতিটাকে তোলবার শক্তি, আমি শুধু চাই এই যে, ভারতের লোক-সকলকে আমি ভালবাসি, যেন এদের জন্যে জীবনধারণ করতে পাই, কাজ করতে পাই, যেন এদের জন্যে আমার জীবন উৎসর্গ করতে পারি।"—এই ছিল মহতো মহীয়ান্ সমীপে অরবিন্দের মহা প্রার্থনা।

ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারকের রায়

আলিপুর-ষড়যন্ত্র মামলার বিচারক যথাসময়ে রায় দিলেন:

আসামী অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সরকার পক্ষ প্রমাণিত করতে সমর্থ হয় নি। অরবিন্দ ঘোষ ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন নি।

উল্লাসকর এবং বারীন্দ্রের প্রতি হ'ল প্রাণদণ্ডের আদশ।

অন্যান্য আসামী প্রাপ্ত হলেন দ্বীপান্তরে গমনের দণ্ড।

বারীন্দ্র এবং উল্লাসকরের প্রতি প্রদত্ত প্রাণদণ্ডাজ্ঞাও পরে, আপীল-বলে বাতিল হয়ে গেল।

সেই সকল ভারত-ভাবুকদের সম্বন্ধে বিশ্বের বিজ্ঞজন চিরকালই ভাববেন:

ভারতের সেই সব স্বরাজ-সাধক
পরাধীনতার মহাপাপহা পাবক।

বিদেশী শাসক-শোষকের মলিন মনের ময়লামাখা সেই মামলার বিবরণ হতে দেখা যায়, তারা, এই দেশের স্বরাজ সাধনা নষ্ট করবার

জন্য মিথ্যা অভিযোগ সৃষ্টি করত; বিচারাধীন বন্দীর উপর পীড়ন করত; এই দেশের মানুষ যাতে তুচ্ছ কানুষ হয়ে থাকে—অস্ত্রবলে বলীয়ান না হতে পারে—সেজন্য অসদুপায় অবলম্বন করত।

পরাধীনতা পাশ ছিন্ন করার অমোঘ উপায় হচ্ছে প্রহরণ।—প্রহরণ প্রচালন পরাধীনতা করতে পারে হরণ। আয়ুধ আয়ুদ। আয়ুধ চালনায় যে জাতি দক্ষ নয়, সে জাতি অন্য জাতির ভক্ষ্য হয়,—মানুষের ইতিহাস এই কথাই কয়।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—এই পৃথিবী বীরের বশ। সে জাতির নেই অস্ত্রবল, সে জাতি যায় রসাতল। অস্ত্রদক্ষতা এবং অস্ত্রানুরাগ মানুষের জীবনকে করে তোলে যেন এক বিশ্বজিৎ যাগ।—অতএব, উঠ! জাগো! অস্ত্রসাধনায় লাগো! স্বদেশের বৈরীকে বল, ভাগো! ভাগো!

ভারতভক্ত বীরবৃন্দকে নিগ্রহ করার আগ্রহ হতে উদ্ভূত ঐ মামলায় ঐরূপ ভাববন্যায় কি উথলায়?

মহাভাবমণ্ডিত অরবিন্দ ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হলেন না। কারামুক্ত হলেন।

কিন্তু পরাধীনতার পাশ হতে ভারততো তখনও মুক্ত হয় নি। অরবিন্দ স্বাধীনতার সাধকদলকে সুসংগঠিত করার কর্মে মনোনিবেশ করলেন।

অরবিন্দের ঐ যুগেই তাঁর লেখনী-খনি হতে উদ্ভূত হয় এক মণি। তার নাম "কারাকাহিনী"। তাঁর সেই "কারাকাহিনী" নানাদিক দিয়েই এই দেশের পক্ষে শক্তিসঞ্চারিণী। ভারতজনের প্রতিভা সম্বন্ধেও তিনি নিবন্ধ রচনা করেন। সেই নিবন্ধের নাম "Brain of India"। কি মার্গ অবলম্বন করলে, ভারত, পুনর্বার ভাতিশীল হয়ে এই ভবক্ষেত্রকে নানাদিক দিয়ে মহাভাব ক্ষেত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হতে পারে, সেই অরবিন্দ-নিবন্ধ তারই ছন্দ।

অরবিন্দের দুইটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে লাগল। একটি পত্রিকার নাম "ধর্ম", অন্যটির নাম "কর্মযোগিন্"। "ধর্ম" বঙ্গভাষায় ; কর্মযোগিন্" ইংরাজী ভাষায়।

ঐ পত্রিকায় যে সব পবিত্র ভাব প্রকাশিত হত, তার পরিচয় প্রদায়করূপে "ধর্ম" হতে এখানে যৎকিঞ্চিৎ প্রদত্ত হচ্ছে :

"যে দিন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গান বাহ্যেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রাণে আঘাত করিল, সেইদিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগিল, মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।......" এই মাতৃপ্রেম, মাতৃমূর্তি জাতির মনে-প্রাণে জাগরিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই কয় বর্ষের উত্তেজনা, উদ্যম, কোলাহল, অপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন

ভগবানের বিধানে বিহিত ছিল। সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার পরে কি?

"তাহার পরে আর্য্যজাতির সনাতন শক্তির পুনরুদ্ধার।......যে মহৎ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে, তাহা কেবল উত্তেজনার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, শক্তি চাই।......সেই শক্তিই মা। তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবার উপায় শিখিয়া লও।......এখন অন্তর্নিহিত মাতাকে আত্মসমর্পণ কর। কার্য্যোদ্ধারের অন্য পন্থা নাই।"

ঐ সকল হতে লক্ষ্য করা যায়, অরবিন্দ তখন বিশ্বশক্তি সাগর হতে অমৃত আহরণে তৎপর। তিনি আগ্নেয় অস্ত্রের উপর নির্ভর করেন না; গুলী-গোলার শক্তির উপর নির্ভর করেন না; গোলোক-লোকের আলোকের শক্তির উপর নির্ভর করেন।

তথাপি, ভারতের বৃটিশ শোষক-শাসক অরবিন্দকে বন্দী করার ফন্দি পরিত্যাগ করল না কদাপি। অরবিন্দের মধ্যে দিব্যভাব মূর্ত, সেটা কি ক'রে দেখবে সেই ধূর্ত!

বিদেশী দুহিতা ভারত ভাব ভাবিতা, ভারত ভাতিদীপিতা ভগিনী নিবেদিতা এক দিন অরবিন্দকে বললেন, ভারত-বৈরী বৃটিশের বাগুরা অরবিন্দকে বিনষ্ট করবার জন্য ব্যাঘ্রবৎ ব্যগ্র হয়ে আছে।

ঐ সংবাদ শ্রবণে, অরবিন্দ লেখনী ধারণ করলেন। বিরচিত হল 'দেশবাসীদিগের প্রতি খোলা চিঠি।" সেই চিঠি প্রকাশিত হ'ল "কর্মযোগিন্" পত্রিকায়। সেই চিঠিতে বা নিবন্ধে লোকে লক্ষ্য করল, অরবিন্দ বলছেন, স্বাধীনতা যারা চায়, তারা কর্ম ক'রে যায় আপন প্রেরণায়।—কে তাঁদের নেতা হলেন, বা, না হলেন, তারা কালকর্তন করে না সে চিন্তায়।"

ত্যাগী অরবিন্দ কর্তৃক নেতৃত্ব ত্যাগ আসন্ন, এই ভেবে, অনেকেই হলেন অপ্রসন্ন, বিষণ্ন।

ফরাসী চন্দননগরে

তখন চলেছে খ্রীষ্টীয় ১৯১০ সাল। ফেব্রুয়ারী মাস। শীত গাইছে মানুষের হিতের গীত। ঐশ্বর্যবন্ত বসন্ত আসে-আসে।

কলিকাতাস্থ শ্যামপুকুর লেনের একটি ভবনে ধর্মযোগিন্ অরবিন্দ "কর্মযোগিন" পত্রিকার কর্মালয় কক্ষে উপবিষ্ট। কি এক ভাবাবিষ্ট। ঐ সময়ে অরবিন্দ সন্নিধানে সমাগত হলেন এক হিতৈষী। তাঁর মুখ হতে অরবিন্দ শ্রবণ করলেন, বিদেশী-শোষক-শাসকের পুলিশ অট্টহাসি হাসছে। তারা অতি সত্বরই আসছে। অরবিন্দকে বন্দী করবে ব'লে আনন্দে যেন নাচছে!

অরবিন্দ কি বিচলিত হলেন?—দৃঢ়মূল অচল কি বিচলিত হয়!

অরবিন্দ আত্মস্থ হলেন। তাঁর চৈতন্যময় চিত্তদেশ থেকে কে যেন ব'লে উঠল, চন্দননগরে গমন কর সত্বর!

কলিকাতার প্রতিবেশী চন্দননগর তখন ফ্রান্সের রাষ্ট্রশক্তির গ্রাসে।

অরবিন্দ অবিলম্বে গমন করলেন কলিকাতার গঙ্গার তীরে। গঙ্গার কল কল লহরীনীরে শ্রবণ করলেন কিসের এক আহ্বান।

একখানি তরী তীরে লগ্ন হ'ল। অরবিন্দ আরোহণ করলেন। তরণী দুলল ও চলল।

অরবিন্দ চন্দননগরে উপনীত হলেন। সেইখানে সুবিখ্যাত ভারত ভক্ত মতিলাল রায় মহোদয়ের ভবন অরবিন্দকে দান করল আলিঙ্গন। সেই স্থানে মাস দেড়েক কাল অবস্থানকালে, অরবিন্দ অবিরাম করে চললেন ধ্যান।—ধ্যানই হ'ল তাঁর পরম ধন।

বিদেশী সরকারের সুপ্তিহীন গুপ্তচরেরাও তখন অবগত হতে পারল না, পরাধীনতার অগ্নি অরবিন্দ কোথায় বিকশিত হয়ে রয়েছেন। অরবিন্দ পুনর্বার তাঁর চিন্ময় চিত্তদেশ হতে বাণী অনুভব করলেন, পণ্ডিচেরীতে গমন কর।

দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত পণ্ডিচেরীও তখন ফরাসী গ্রাসে।

অরবিন্দ অবিলম্বে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন। অবস্থা অনুসারে, ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন। এক ফরাসী অভিযানে আরোহণ করলেন। যথাসময়ে, পুরুষপ্রবর পণ্ডিচেরীতে পদার্পণ করলেন। একজন বাঙ্গালী যুবকও তখন ছিলেন তাঁর সঙ্গী।

সেই স্মরণীয় দিনটি হচ্ছে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল।

ধ্যানে ও জ্ঞানে

অরবিন্দকে বৃটিশ শাসিত ভারতে আনয়ন করার জন্য বিদ্বেষ্টার অসাধু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল বার বার।

ভারতের ভাই-ভগিনীরা প্রীতি প্রচেষ্টা, সাধু প্রচেষ্টাও করেছিলেন। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশসেবিকা সরলা দেবী এবং বোম্বাইয়ের ব্যাপ্টিস্টা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা দেখলেন, অরবিন্দ প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক নন। দেশনায়ক লালা লাজপৎ রায়, মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পুত্র দেবদাস গান্ধী প্রভৃতিও সেখানে গিয়েছিলেন।

অরবিন্দ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে বলেছিলেন: "প্রিয় চিত্ত, আগেকার উদ্দেশ্য বা প্রেরণা নিয়ে আমি আর কার্যক্ষেত্রে নামব না। আমি একটা ঊর্ধ্বতর লক্ষ্যের সন্ধানে আছি—সেই লক্ষ্যে পৌছুতে পারলে, তাকেই ভিত্তি করবো আমার কাজ সুরু করবার।"

পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দের জীবন কিরূপে অতিবাহিত হতে লাগল ?

অতিবাহিত হতে লাগল ধ্যানে ও জ্ঞানে। অধ্যয়নে, সদালাপনেও বিরত ছিলেন না। অন্নগ্রহণ, নিদ্রাগ্রহণও পরিত্যক্ত হয় নি। আম্নায়-অধ্যয়ন বা বেদ অধ্যয়ণও সুসম্পন্ন হ'ল।

শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক—এই ত্রিবিধ উন্নতি সব মানবের পক্ষেই প্রয়োজন। অরবিন্দ জীবন ঐ সব বিষয়ে উদাসীন রইল না। যাহা কিছু ভালো, যাহা কিছু আলো—যাহা কিছু দূর করে কালো—অরবিন্দ-জীবন হল সেই মহামার্গাবলম্বী।

অতিবাহিত হল চারিটি বর্ষ।

সেই চারিটি বর্ষ যেন পরম স্পর্শমণির স্পর্শ।

আর্য

"আর্য" কি ?

একখানি মাসিক পত্রিকার নাম "আর্য"।

"আর্য" পত্রিকার কার্য কি ?

অধ্যাত্ম বিষয়ক বাণী বিস্তার।

"আর্য" পত্রিকার আবির্ভাব হ'ল কিরূপে ?

ফরাসী মহিলা মীরা রিশার বর্তমানে মহীয়সী "শ্রীমা" ব'লে বন্দিতা হন। তিনি মিশরের ফ্যারাও কুলের কন্যা। তাঁর পার্থিব জীবনের বহুকাল পূর্বে, তাঁর পূর্বপুরুষ ফ্রান্সে আগমন করে স্থায়ী অধিবাসী হয়ে যান। মীরা রিশারের পিতা ছিলেন ফ্রান্সের একজন ব্যাঙ্কার। ভ্রাতা ছিলেন আফ্রিকার গভর্ণর জেনারেল। মীরা রিশার তাঁর বাল্যকাল হতেই ছিলেন সাধু-সন্ধানী। তাঁর স্বামী ফরাসী

মনীষী পল্ রিশার-এর নিকট অবগত হয়েছিলেন পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দের অবস্থানের কথা।

বিগত ১৯১৪ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মীরা রীশার তাঁর স্বামী সমভিব্যাহারে আগমন করলেন পণ্ডিচেরীতে। তার পূর্বে তাঁরা কিছুকাল ছিলেন মিশরে ও জাপানে। তাঁরা যেরূপ সাধু মহাপুরুষ দর্শনের আশা পোষণ করেছিলেন, অরবিন্দকে দেখলেন সেইরূপ সাধু মহাপুরুষ।

অরবিন্দের অনুভূত অমৃতময় ভাবরাশি মানব মঙ্গলার্থে প্রচারের জন্য একখানি পত্রিকা প্রকাশের ব্যয়ভার তাঁরা বহন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তদনুসারে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দের আবির্ভাব দিবসে আবির্ভূত হল "আর্য"।

কে আর্য? কাকে বলে আর্য? সেই সম্বন্ধে অরবিন্দ দিলেন তাঁর এইরূপ বাণী।—আর্য তিনি সর্ববাধা বিজয়ে ইচ্ছুক যিনি। আর্য তিনি, সর্বপ্রকার বৈরীকে বশীভূত করেন যিনি।

সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত বেদ ও উপনিষদ ইত্যাদির ইংরাজী অনুবাদ, বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার এবং আরও নানরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান গর্ভ প্রবন্ধ প্রসূনে "আর্য" আর্যতা প্রাপ্ত হত। সেই সমুদয়ই হত অরবিন্দ রচনা।

পত্রিকাটির ছিল ফরাসী ভাষার একটি সংস্করণ, এবং একটি ইংরাজী সংস্করণ। প্রথম বিশ্বসংগ্রাম কালে, মহীয়সী শ্রীমা এবং তাঁর স্বামী, তাঁদের স্বদেশের আদেশে, স্বদেশে গমন করেন। তখন "আর্য" পত্রিকার ফরাসী সংস্করণ অবলুপ্ত হয়ে যায়। ইংরাজী সংস্করণটি প্রচলিত থাকে।

"আর্য" পত্রিকার আর্য পাঠক কবীন্দ্র রবীন্দ্রাগ্রজ বিবুধ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমতে, সেই সব অরবিন্দ-প্রবন্ধে অশ্রুতপূর্ব মহাবাণী প্রকাশ পেয়েছে। বেদ-গীত-তন্ত্র যেন একসঙ্গে মিলিত

হয়েছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত "আর্য" পত্রিকাটি পৃথিবীতে ছিল সপ্তবর্ষ মাত্র। সপ্তর্ষির প্রায়।

প্রথম বিশ্বসংগ্রাম বিশ্বকে নানাক্ষেত্রে নিঃস্ব ক'রে নির্বাপিত হ'ল।

মহীয়সী শ্রীমা ফ্রান্স হতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রত্যাবর্তন করলেন পণ্ডিচেরীতে। অরবিন্দ আবাসের সুব্যবস্থার কর্মভার গ্রহণ করলেন। তখন ঐস্থানে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গীও শিষ্য সংখ্যা জন দশেকের মতো হবে। শ্রীমা সেই স্থানে একটি আশ্রম সংগঠনে শ্রমশীলা হলেন। তাঁর ইয়োরোপীয় পরিচ্ছদ পরিত্যক্ত হ'ল। তিনি হলেন ভারতীয় শাড়ী-ধারিণী। তাঁর মৎস্য ও মাংসাহার পূর্বেই বর্জিত হয়েছিল। আশ্রমের জন্যে তিনি আরও আবাসের ব্যবস্থা করলেন। ভারত স্বাধীনতা সমৃদ্ধ হওয়ার বহুবর্ষ পূর্বে তিনি অরবিন্দ সমীপে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, শোণিত আহুতি ব্যতীতই ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন হবে।—আয়ুধের আস্ফালনে মানুষের আয়ুহরণ না হয়েই, ভারতের স্বরাজ-সূর্য সমুদিত হবে।

শ্রীমা মহতী শক্তির অধিকারিণী। মানব মঙ্গলের ক্ষেত্রে, তিনি যেন দেবী সর্বমঙ্গলা।

ভারতে স্বাধীনতাদীপ প্রজ্বালন প্রচেষ্টাপরায়ণ বিপ্লবী অবিনাশ ভট্টাচার্যকে বৃটিশের বিচারে দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। দ্বীপান্তর দণ্ডান্তে ভারতে আগত হয়ে তিনি অরবিন্দ সন্নিধানে গমন করেন। অরবিন্দ আশ্রমের সর্ববিধ সংযম ও সুব্যবস্থার অবস্থাদর্শনে অবিনাশ অপূর্বভাবে মুগ্ধ হন। সেই আশ্রম মানুষের এক অনুপম আশ্রয়। আশ্রম হ'তে অবিনাশের প্রত্যাবর্তন কালে, মাতৃমকরন্দময়ী শ্রীমা শ্রীঅবিনাশের সর্বপ্রকার পাথেয়ই তাঁর সঙ্গে প্রদান করেন।

মর্ত্যের মহীয়সী মৃণালিনী অমর্ত্য ধামে

পরম পথাবলম্বী পুরুষপ্রবর শ্রীঅরবিন্দ যখন পণ্ডিচেরীতে অবস্থিত, তাঁর সহধর্মিণী মহীয়সী মৃণালিনী তখন সেইস্থানে অবস্থিতা নন! তিনি তখন দূরে। তাঁর স্বামী দেবতা তখন তাঁর অন্তর-পুরে।

খৃষ্টীয় ১৯১৮ সালে, মহীয়সী দেবী মৃণালিনী পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ সন্নিধানে গমণের সুযোগ প্রাপ্ত হন। তিনি তখন তাঁদের রাঁচির ভবন ত্যাগ করেন। কলিকাতায় আগমণ করেন। পণ্ডিচেরী যাত্রায় প্রস্তুত হন।

কলিকাতা তখন ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের জ্বালায় জর্জরিত। মৃণালিনী জ্বরাক্রান্তা হলেন। সেই জ্বরের ফলে, তিনি চিরতরে চলে গেলেন নির্জরজগতে।

চিত্তে তাপপ্রদ সেই ঘটনা ঘটেছিল ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ১লা পৌষ, অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুর ভবনে। অরবিন্দের পণ্ডিচেরী গমণের নব বর্ষ পরে।

পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ আশ্রম

অরবিন্দ আশ্রম একাধারে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসের সমন্বয়, এইরূপই মনে হয় না কি ?

এই আশ্রমে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ—এই ত্রিযোগের ত্রিবেণীসংগম। তথাকথিত দিব্য জীবন। এবং তথাকথিত বৈষয়িক জীবন, এখানে এক সুমহান জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এই আশ্রম সর্বপ্রকার উৎকর্ষের কৃষিক্ষেত্র। তাই নয় কি ?

শান্তি ও স্বাধীনতার সন্ধানে আমি পণ্ডিচেরীতে এসেছিলাম।........ পণ্ডিচেরী ·.....আমার তপস্যার গুহা...........আমার নিজ ধারণা সম্মত তপস্যা।......

আমি রাজনীতি অথবা রাজনীতির কাজকে মোটেই তুচ্ছ মনে করি না, অথবা নিজেকে এসবের উর্ধ্বে বলেও ভাবিনা। আমি চিরদিন আধ্যাত্মিক জীবনের উপর জোর দিয়ে এসেছি··.........কিন্তু আধ্যাত্ম জীবন বলতে আমি....... ঐহিক ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে যাওয়া—সে সম্বন্ধে ঘৃণা বা অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ বুঝি না! আমার কাছে কিছুই ঐহিক নয়। আমার মতে মানুষের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাই সুসম্পূর্ণ অধ্যাত্ম জীবনের অঙ্গ এবং বর্তমানে রাজনীতির গুরুত্বও যথেষ্ট।...”
—এইরূপ শ্রীঅরবিন্দের বাণী।

ঐ সব থেকেই বুঝতে পারা যায়, ঐ আশ্রমটির বিশেষত্ব।

এখানকার পরিকল্পিত “শ্রীঅরবিন্দ-আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়” হল বিদ্যা বলতে যা কিছু বোঝায়, তারই আলয়।

ধর্ম-কর্ম-শর্ম-নর্ম সমন্বয়ভূমি

অরবিন্দ শতদলে বিকশিত। শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমও সেইরূপ। দৈহিক-মানসিক-আত্মিক বিকাশ ভূমি।

এই আশ্রমে রয়েছে অনেক ঘর-বাড়ী, অনেক বৃক্ষলতা, অনেক কর্মকেন্দ্র। রয়েছেন বিভিন্ন বয়সের নর-নারী। তাঁরা বিভিন্ন-ভাষা-ভাষী। তাঁরা বিভিন্ন কর্মের কর্মী। সকলেই সমন্বয়ধর্মী। আশ্রমবাসী হচ্ছেন এক সহস্র অপেক্ষাও অধিক। তাঁরা মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনে সততই উৎসুক। তাইতেই তাঁদের সুখ।

এই আশ্রমে আছে বিদ্যালয়, শিল্পালয়, গ্রন্থালয়, ব্যায়ামালয়, মুদ্রণালয়,—মানুষের পক্ষে যা কিছু প্রয়োজন হয়। এই অমরজীবন উদ্যানে কত পুষ্প—কবি, দার্শনিক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, গায়ক, কৃষক, শিল্পী, কারিগর, আরও কত প্রকার।

এখানেই অনেকটি ভাষাতেই পুস্তক মুদ্রিত হয়। নানারূপ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এখনকার বালক-বালিকারা অনেকেই অনেকটি ভাষা খাসা ক'রেই প্রকাশ করতে পারে।

নৃত্য-গীত-অভিনয় এখানকার জীবনে অনুপস্থিত নয়। বসন-বাসন ধৌত করণ, রন্ধন-বয়ন সর্ব হস্তে হয় সম্পাদন। যা কিছু আলো যা কিছু ভালো,—তাই দিয়ে এখনকার জীবন কতই জমকালো।

"বুলেটিন্ অব্ ফিজিক্যাল্ এডুকেশনে" এখান থেকে প্রকাশিত হয়। অত্রস্থ অতিথিশালাটির নাম শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের রূপ বিশ্বরূপ। আশ্রমখানি অমৃতধানী।

আশ্রমের বালক-বালিকাদের প্রতি তথা বিশ্বের বালক-বালিকাদের প্রতি শ্রীমায়ের মঙ্গল, মহনীয় বাণীর রূপ এইরূপ :

"তোমাদের উদ্দেশ্য হবে উচ্চ এবং প্রশস্ত, উদার এবং অনুরাগশূন্য। এইগুলিই করবে মূল্যবান তোমার জীবনকে তোমার নিজের কাছে এবং অন্যের কাছেও।"

আশ্রমের আশ্রমীরা বলেন, ঈশ্বর সমীপে কর্মই আমাদের পরম প্রার্থনা।

বিশ্বের অরবিন্দ অরবিন্দের অমর জীবন

এই মরজগতে বিশ্বের অরবিন্দ অরবিন্দ অমর জীবন যাপন করেছেন। তাঁর জীবন উদ্যানে সর্বসুকর্মকুসুম বিকশিত। তাই তো অরবিন্দ-অরবিন্দে বিশ্বমানব মাধুকর আকৃষ্ট ও প্রহৃষ্ট।

শ্রীঅরবিন্দ দিব্যজীবন যাপন কালেও সর্বদা সর্বতোভাবে মানব-মঙ্গলে উদ্যোগী ছিলেন। প্রতিদিন এদেশের ও বিদেশের বহুস্থান হতে বহুলোকের পত্র তাঁর সমীপে উপস্থিত হত। তিনি প্রত্যেকখানি পত্রের উত্তর দিতেন। এমন কি, কোন কোন দিন, পত্রের উত্তর রচনা করতে করতে, রাত্রি শেষ হয়ে যেত। মানব মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কর্মকেই তিনি তুচ্ছ কর্ম ব'লে গণ্য করলেন না। তাঁর সেই সব পত্র "Letters of Sri Aurabindo" নামে বিখ্যাত।

ধ্যান এবং যোগসাধনায় তিনি এরূপ অভ্যস্ত হয়েছিলেন, যে নেত্রদ্বয় মুদ্রিত না ক'রেও ঐ দুই সুমহৎ কর্ম তিনি সম্পাদনে সমর্থ ছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন আত্মস্থ মহামানব। তিনি একটি ভবন মধ্যে পঞ্চবিংশবর্ষকাল অতিবাহিত করেন। মানুষের সঙ্গে চর্মচক্ষের সাক্ষাৎ বড় হত না; হ'ত মর্মচক্ষের সাক্ষাৎ। তাঁর দিব্য দৃষ্টি বিশ্বের উপর করত অমৃতবৃষ্টি।

শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবস ১৫ই আগস্ট, শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধি দিবস ২৪শে নভেম্বর। শ্রীমায়ের জন্মদিবস ২১শে ফেব্রুয়ারী, শ্রীমায়ের দ্বিতীয় বার পণ্ডিচেরীতে আগমন দিবস ২৪শে এপ্রিল, প্রতি বৎসর এই চারিটি দিবস ছিল সকলের পক্ষে শ্রীঅরবিন্দ দর্শন প্রাপ্তিদিবস।

গ্রন্থ মানবের সঙ্গে মানবের গ্রন্থিবন্ধন করে—মানুষকে মানুষের আপন ক'রে তোলে।

অরবিন্দ যে সকল গ্রন্থ বিরচন করেছেন, সে সকল অরবিন্দবৎ। The Life Divine, Essays on Gita, Human Cycle, Savitri, The Mother Synthesis of Joga এবং আরও নানারূপ গ্রন্থ তাঁর বিরচিত।

"সাবিত্রী" একখানি মহাকাব্য। শ্রীঅরবিন্দের বরোদায় অবস্থানকালে এই মহাকাব্য-কুসুম প্রস্ফুটিত হতে আরম্ভ হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্বকালে ঐ মহাকাব্য রচনায় লেখনী প্রায় বিরতই ছিল। পণ্ডিচেরী-পর্বে পুনর্বার ঐ রচনা অগ্রসর হয়। এ গ্রন্থে পঙ্‌ক্তির সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ সহস্র। এর মধ্যে মানবের প্রয়োজনীয় বিষয় অজস্র। সুবিখ্যাত "সাবিত্রী ও সত্যবান" কাহিনীর রূপক-রূপে এটি বিকশিত। সাবিত্রী সত্যবানকে মৃত্যুর গ্রাস হতে উদ্ধার করেছিলেন। "সাবিত্রী" মহাকাব্যের সাধনা হ'ল দুঃখ-জর্জর বিশ্বমানবের মঙ্গল সম্পাদন। The life divine গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যদৃষ্টি দৃষ্ট সত্য ও তত্ত্ব পরিব্যক্ত।

শ্রীনীরদবরণ হচ্ছেন অরবিন্দ রচনার লিপিকার।

অরবিন্দ রচনা অনন্য হিরণ্য !

শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধিদিবস

শ্রীঅরবিন্দের পার্থিব জীবনের বয়ঃক্রম ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে হল চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ষ। ঐ বর্ষে শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র জন্মদিন সমাগত হল ১৫ই আগস্ট।

ঐ দিব্য দিবসে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আদর্শ অনুসরীদের সম্মুখে এইরূপ ব্যক্ত করলেন : আমাদের এই যোগের উদ্দেশ্য কি ?

উদ্দেশ্য মানব-চেতনার অপেক্ষা এক মহত্তর চেতনাকে মানবমণ্ডলীর মধ্যে অবতরণ করানো। সেই মহাচেতনার বলে মানুষের জীবনের বর্তমান অবস্থা আর বর্তমান থাকবে না, সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

এর পরে, মাসত্রয় অতিবাহিত হ'ল।

এল একটি দিন—২৪শে নভেম্বর।

শ্রীমা আশ্রমবাসীদের বললেন, আজ সন্ধ্যালগ্নে সকলে শ্রীঅরবিন্দের অবস্থান ভবনের উর্ধ্বতলে গমন করবে।

যথাসময়ে সকলে সেই স্থানে গমন করলেন। সেখানে তখন রয়েছে একখানি চেয়ার শ্রীঅরবিন্দের উপবেশনের জন্য। চেয়ারের পশ্চাতে লম্বমান একটি রেশমী পর্দা। তিনটি ড্রাগন চিত্র সেই পর্দায় অঙ্কিত। ড্রাগনত্রয়ের একত্র অবস্থান সিদ্ধি প্রাপ্তিসূচক।

সেইস্থানে সমুপস্থিত হলেন শ্রীঅরবিন্দ। চেয়ারে উপবেশন করলেন। অরবিন্দের নয়ান-বয়ান তখত এক অদ্বিতীয় অরবিন্দ-শ্রীশোভমান। তখন সকলেই ধ্যানস্থ হলেন। ধ্যানলোকে সকলে উপলব্ধি করলেন ত্রিদিবের নন্দনানন্দ। প্রায় পৌণে একঘণ্টাকাল

ধ্যানান্তে, সকলের সন্নত শিরে বর্ষিত হ'ল অরবিন্দ-আশিস্। ঐ দিবস শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধিদিবস। সে এক দিব্যদিবস।

অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন শ্যামবর্ণ। শ্রীঅরবিন্দ হয়ে গিয়েছিলেন উজ্জ্বল—সমুজ্জ্বল গোলাপী গৌর। তাঁর নয়নে দ্যুতি, বয়ানে দ্যুতি, বপুব্যাপী দ্যুতিবিভূতি।

পরম প্রশ্ন ও চরম উত্তর

জিজ্ঞাসুরা শ্রীঅরবিন্দকে নানা প্রকার প্রশ্ন করতেন।

শ্রীঅরবিন্দের অরবিন্দবৎ উত্তরও তাঁরা পেতেন। সেইরূপ কয়েকটির রূপ কতকটা এইরূপ :

প্রঃ—ঈশ্বর ব'লে কেউ কি আছেন ?

উঃ—নিশ্চয় আছেন।

প্রঃ—ঈশ্বরদর্শনের পন্থা কি ?

উঃ—প্রয়াস।

ঈশ্বরেতে আত্মনিবেদন
ঈশ্বরদর্শনমার্গ করে বিরচন।

প্রঃ—মানুষের পক্ষে ঈশ্বরকে কি সুস্পষ্ট রূপে দর্শন করা সম্ভব হয় ?

উঃ—হয়। চেতনা অজ্ঞানতার যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত। ঈশ্বরের করুণা লাভ হলে, সেই যবনিকা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়ে, চেতনা-নয়নে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হন।

প্রঃ—আপনি ঈশ্বর প্রাপ্ত পুরুষ। সুতরাং যোগমগ্ন হওয়ার আপনার আর প্রয়োজন কি ?

উঃ—এই যোগসাধনা মদর্থে নয়। পৃথিবীতে এক পরম পরিবর্তন সংঘটনের জন্যই এই যোগ।

প্রঃ—ঈশ্বর দর্শনের জন্য প্রবল স্পৃহা থাকা সত্ত্বেও, ঈশ্বরদর্শন যদি না ঘটে, তা হ'লে ?

উঃ—যে চাওয়ার মতো চায়,

সে অবশ্যই পায়।

মন ঈশ্বরমুখী হ'লে, সকল বাধা ক্রমে ক্রমে যায় চ'লে।

প্রঃ—আপনি হয় তো আপনার প্রত্যয় প্রকাশিত করছেন। এ সব কি বিজ্ঞান সম্মত ?

উঃ—একেও বিজ্ঞান বহির্ভূত বলা যায় না। বিজ্ঞান প্রথম প্রকট হয় কখন ? মনে কোন একটা অনুভূতি আসে যখন। অতঃপর সেই সম্বন্ধে হয় পরীক্ষাকার্য সম্পাদন।

শ্রীঅরবিন্দ দিবস

শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব দিবস ১৫ই আগষ্ট। ভারতের স্বাধীনতাদিবস ১৫ই আগষ্ট। ১৫ই আগষ্ট ভারতের পরম দিবস।

ঐ পরম দিবস উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দের যে বাণী বিঘোষিত হয়েছিল, তার রূপ মোটামুটি এইরূপ :

আমার জন্মদিনে হল ভারতে স্বাধীনতার আবির্ভাব। এ তো ঈশ্বরের আশিস্।

আমার সমগ্র জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সমুদয় সাফল্যমণ্ডিত প্রায়।

ভারতকে ঐক্যবদ্ধ, সখ্যবদ্ধ ক'রে, বিপ্লববাহ্নি প্রজ্বালন এবং ভারতের স্বাধীনতা সমুপার্জন, আমার এই আকাঙ্ক্ষা বর্তমানে সাফল্যে শোভমান।

সমগ্র এশিয়ার সমুত্থান, সমগ্র বিশ্বের সমন্বয়কর্মে এশিয়ার এক সুমহান অবদান, আমার এই কাম্য ও বর্তমানে সাফল্যের পথে।

বিশ্বের মানব মণ্ডলীর মধ্যে সংঘটিত হবে এক মহামিলন—বিকশিত হবে এক অভিন্ন ভাববন্ধন—সমগ্র মানব করবে এক সমুন্নতি-মঞ্চে আরোহন,—আমার এই অভীপ্সা বর্তমানে অগ্রসরশীল।

ভারতের আধ্যাত্মিক আলোক বিশ্বমানবকে মহাআলোক-লোকের পুলকপন্থা প্রদর্শন করবে। মদীয় এই আশারও ক্রম সাফল্য দৃষ্ট হচ্ছে ভারতের দেশে।

মানুষের মানস, ওজস্ তেজসম্পূর্ণ হয়ে উচ্চতর স্তরে আরূঢ় হবে; —আমার এই আশা অন্ততঃ দু'-চার জনের মধ্যেও প্রদৃষ্ট হচ্ছে।—এইটিও একদা সমাসীন হবে সাফল্যের স্বর্ণাসনে।

দিব্য জীবন দিব্যধামে

শ্রীঅরবিন্দের শরীর রোগ-শরে বিদ্ধ হচ্ছিল। চিকিৎসকেরা ঔষধ প্রয়োগ করতে চাইছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ বললেন, ঔষধ দিয়ে রোগবধ প্রয়োজন হবে না। পীড়া আপনা হতেই প্রস্থান করবে।

ক্রমে ক্রমে ঘটলও ঠিক তাই। পীড়া অরবিন্দবপু পরিত্যাগ ক'রে প্রস্থান করল।

পণ্ডিচেরীতে চত্বারিংশৎ বর্ষকাল যাবৎ শ্রীঅরবিন্দ বপুর সঙ্গে ঔষধের সংস্পর্শ ঘটেনি।

খৃষ্টীয় ১৯৫০ অব্দে ২৪ নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দ দর্শন দিবসে কতলোক শ্রীঅরবিন্দ দর্শন করলেন।

এর পরেই, শ্রীঅরবিন্দ দেহে আবার হ'ল আময়ের আক্রমণ।

অরবিন্দের দেহে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন।

কলিকাতা হতে সুবিজ্ঞ শল্যচিকিৎসক পণ্ডিচেরীতে চলে গেলেন। শ্রীঅরবিন্দবপুতে অস্ত্রোপচার করার প্রস্তাব হল।

কিন্তু অরবিন্দ তাতে অসম্মত।

জীবন সন্ধ্যার পর্ববর্তী সন্ধ্যায় শ্রীঅরবিন্দ বেশ সুস্থবোধ করলেন। চেয়ারে উপবেশন করলেন।

ভক্তরা জিজ্ঞাসা করলেন, আময়ের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে যোগশক্তিকে কেন অবতীর্ণ করছেন না?

এটা আমি তোমাদের বোধগম্য করতে পারব না। তোমাদেরও বোধগম্য হবে না।—এইরূপ হ'ল অরবিন্দের উত্তর।

অতঃপর আময়ের আক্রমণ আরও প্রবল হল।

৫ই ডিসেম্বর। সোমবার। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত।

শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন এইবার দিব্যধামে।

ধরণী শ্রীঅরবিন্দের বিগত প্রাণবপুটি বক্ষে ধারণ ক'রে উপবিষ্টা।

যাহা কিছু ভাল আর কালজয়ী আলো,
তাই দিয়ে অরবিন্দ চিন্ময় রসালো।

সমাধিস্থ

শ্রীঅরবিন্দের দেহে তখন প্রাণ নেই; কিন্তু তাঁর পঞ্চত্বপ্রাপ্তির কোন লক্ষণও নেই। তখনও ভাসোদ্ভাসিত তাঁর নয়ান; ভাসোদ্ভাসিত তাঁর বয়ান।

অতঃপর মৃত্যুমালিন্য প্রকট হল অরবিন্দবদনে।

আশ্রম মধ্যে অরবিন্দবপু্ সমাধিস্থ হ'ল।

রাশি রাশি ফুল প্রত্যহ সেই অতুলকে অর্চনা করে।

সমাধিদেহে বিরচিত রয়েছে শ্রদ্ধার বাণী।

স্বদেশী ও বিদেশী প্রশস্তি

অরবিন্দ দ্বারা মানুষ দেবতার অর্চনা করে। কবীন্দ্র রবীন্দ্র তাঁর কবিতাদ্বারা অরবিন্দ অর্চনা করেছেন:

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি।......
......তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন? তাই উঠে বাজি
জয়শঙ্খ তাঁর। তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে বিদ্ধ করি দেশের আঁধার
ধ্রুবতারকার মতো। জয় তব জয়।"
...   .

ফরাসী মনীষী পল্ রিশার-এর অরবিন্দ-বন্দনা এইরূপ ঃ

"আমি পৃথিবীর সর্বত্র সাধুসন্ন্যাসীর সন্ধানে পর্যটন করিয়াছি। অবশেষে, পণ্ডিচেরী গমন করিয়া, আমি যথার্থ সাধুদর্শন করিলাম। এই সাধু শ্রীঅরবিন্দ। তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার যোগৈশ্বর্য এবং দিব্যজীবনের জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করিয়া, আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে, যে শ্রীঅরবিন্দ কেবলমাত্র ভারতের নহেন, তিনি সমগ্র এশিয়ার ধর্মগুরু এবং ইনিই পৃথিবীর ত্রাণকর্তা।"

অরবিন্দ বাণী-বৈভব

অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলো মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্বত, নদী বলিয়া জানে ; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।........"

"...যাহা পরিবারের ভরণপোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, ...আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর।....এই দুর্দিনে...আমার ভাইবোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়"

"...শিক্ষা, শিল্প, রাজনীতি, বাণিজ্য, শাসনব্যবস্থা-এর প্রত্যেক অনুষ্ঠানে আমাদের স্বদেশীমন্ত্র গ্রহণ করে আমাদের জাতীয়তা বজায় রাখতে হবে।—"

"...অধ্যাত্মজীবন বলতে আমি মুনি-ঋষিদের মতো ঐহিক ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে যাওয়া—সে সম্বন্ধে ঘৃণা বা অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ

বুঝি না। আমার কাছে কিছুই ঐহিক নয়। আমার মতে মানুষের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাই সুসম্পূর্ণ অধ্যাত্ম-জীবনের অঙ্গ এবং বর্তমানে রাজনীতির গুরুত্বও যথেষ্ট। ভারতবর্ষকে ইয়োরোপের পিছনে পিছনে ছোটবার চেষ্টা না করে রাজনীতিক্ষেত্রে এবং অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে নিজস্ব একটি মৌলিক পন্থা বেছে নিতে হবে।..."